দারুচিনি দ্বীপ

১

'মা, আমার চশমা? আমার চশমা কোথায় মা?'

শুভ্র হাহাকার করে উঠল। শুভ্রর মা, গাঢ় মমতা নিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন। কি অদ্ভুত ভঙ্গিতেই না শুভ্র হাঁটছে। দুই হাত বাড়িয়ে অন্ধের মতো হেলতে দুলতে এগুচ্ছে। তার সামনে চেয়ার। এক্ষুণি চেয়ারের সঙ্গে ধাক্কা খাবে।

'মা, আমার চশমা কোথায়?'

বলতে বলতে সে সত্যিই চেয়ারের ধাক্কা খেল। শুভ্রর মা উঠে এসে ছেলেকে ধরে ফেললেন। শুধু ধরলেন না—চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তাঁর মনটাও খারাপ হয়ে গেল। এত খারাপ শুভ্র'র চোখ? চেয়ারের মতো বড় জিনিসও তার চোখে পড়ে না?

'কথা বলছ না কেন মা? চশমা কোথায়?

'রাতে শোবার সময় কোথায় ছিল?'

'বালিশের পাশে রেখেছিলাম। মাথার ডান দিকে। সব সময় যেখানে রাখি।'

'তা হলে ওখানেই আছে।'

'নেই তো। আমি পাঁচ মিনিট ধরে খুঁজেছি।'

'চশমা ছাড়া তুমি কিছুই দেখ না?'

শুভ্র হাসি মুখে বলল, এক ধরনের প্যাটার্ন দেখি মা। লাইট এন্ড ডার্কনেস। কোথাও বেশি আলো, কোথাও কম, কোথাও অন্ধকার—এই রকম। খুব ইন্টারেস্টিং।

'এর মধ্যে ইন্টারেস্টিং কি আছে?'

'আছে। না দেখলে বুঝবে না। চশমা ছাড়া সব কিছুই এলোমেলো, এক ধরনের ক্যাওস—ডিসঅর্ডার। চশমা পরা মাত্রই অর্ডার। তোমরা এইটা কখনো বুঝবে না।'

'ভাগ্যিস বুঝছি না। তোমার মতো আরো এক জন থাকলে পাগল হয়ে যেতে হত। সারাক্ষণ চশমা, চশমা, চশমা। দিনে দশবার চশমা হারাচ্ছো। সারাক্ষণ চোখে দিয়ে রাখলেই পারো, খুলে ফেল কেন?'

'বেশিক্ষণ অর্ডার ভালো লাগে না। চশমা খুলে ডিসঅর্ডারে চলে যাই। মা, এখন তুমি কি দয়া করে চশমাটা আনবে?'

তিনি চশমা আনতে গেলেন। বালিশের কাছে পাওয়া গেল না। পাওয়া গেল সাইড টেবিলে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। কাল রাতে শুভ্র লাইট জ্বালিয়েই ঘুমিয়েছে। বিছানার উপর দুইটা বই। একটার নাম Brief History of Time, মনে হচ্ছে ফিজিক্স-এর কোন বই। অন্যটা রগরগে কোনো বই হবে। সম্পূর্ণ নগ্ন এক তরুণীর ছবি প্রচ্ছদে ছাপা। শুভ্র কি এই জাতীয় বই পড়তে শুরু করেছে? এই সব বই কি তার এখন ভালো লাগছে? সে কি বড় হয়ে যাচ্ছে? ঐতো মনে হয় সেদিন রাত দুপুরে তাঁর দরজায় ঠক ঠক করে কাঁপা গলায় বলল, মা আমি কি তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারি? আমার খাটের নিচে কে যেন শব্দ করছে?

'কে শব্দ করছে?'

'বুঝতে পারছি না—ভূত হতে পারে। ভূতের মতো মনে হলো।'

'ভয় পেয়েছ?'

'হুঁ। খুব বেশি না—অল্প ভয় পেয়েছি।'

তিনি দরজা খুলে দেখলেন তাঁর ন' বছর বয়েসী শুভ্র ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে। তিনি হাত ধরার পরও সেই কাঁপুনি থামল না।

'চল দেখে আসি কি আছে খাটের নিচে।'

'আমার দেখতে ইচ্ছা করছে না—মা।'

'ইচ্ছা না করলেও দেখতে হবে। ভূতপ্রেত বলে কিছু যে নেই এটা জানতে হবে না? এসো।'

খাটের নিচে উঁকি দিতেই একটা বিড়াল বের হয়ে এল। তিনি বললেন, শুভ্র বাবা, তুমি কি বিড়ালটা দেখতে পেয়েছ?

'হ্যাঁ।'

'বুঝতে পেরেছ যে এটা ভূত না।'

'হ্যাঁ।'

'এখনো কি আমার সঙ্গে ঘুমুতে চাও?'

শুভ্র চুপ করে রইল। মা'র সঙ্গে ঘুমুনোই তার ইচ্ছা, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছে না। মা'র সঙ্গে ঘুমুনোর অজুহাত এখন আর নেই।

'চুপ করে আছ কেন বাবা, বল এখনো আমার সঙ্গে ঘুমুতে চাও?'

'তুমি যা বলবে তাই...'

'আমার মতে তোমার নিজের বিছানাতেই ঘুমানো উচিত। দুটি কারণে উচিত। প্রথম কারণ, এতে ভয়টা পুরোপুরি কেটে যাবে। দ্বিতীয় কারণ, মাসে একবার তুমি আমার সঙ্গে ঘুমুতে পার। এ মাসের কোটা তুমি শেষ করে ফেলেছ। এখন যদি ঘুমাও সামনের মাসে ঘুমুতে পারবে না।'

শুভ্র কোনো কথা না বলে ছোট ছোট পা ফেলে খাটের দিকে রওনা হলো। যেন ছোট্ট একটা পুতুল হেলতে দুলতে যাচ্ছে। মাথা ভর্তি রেশমী চুল, ধবধবে শাদা মোমের শরীর, লালচে ঠোঁট। দেবশিশু, মর্ত্যের ধুলো কাদার পৃথিবীতে যেন ভুলক্রমে চলে এসেছে। তার মাথা নিচু করে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে তিনি অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে পড়লেন। ইচ্ছা করল ছেলেকে আবার ডাকেন। তা সম্ভব না। একবার যা বলা হয়েছে তা ফিরিয়ে নেয়া ঠিক না। তাঁর একটিমাত্র সন্তান, তাকে তিনি ঠিকমত মানুষ করবেন। অতিরিক্ত আদরে নষ্ট করবেন না।

সেই শুভ্র এখন এত বড় হয়েছে?

কত হলো তার বয়স? বাইশ? কি আশ্চর্য!

সময় এত দ্রুত যায়? বাইশ বছর তো অনেক দিন। তাঁর ছেলে জীবনের তিন ভাগের এক ভাগ সময় এর মধ্যে শেষ করে ফেলেছে? এখন সে আগ্রহ বোধ করতে শুরু করেছে তরুণীদের প্রতি। তার বিছানায় নগ্নতরুণীর ছবি আঁকা বই। খুবই স্বাভাবিক। বয়সের দাবী। একে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করার কোন পথ নেই।

আচ্ছা শুভ্রর এখন একটা বিয়ে দিলে কেমন হয়।

তার মতোই সুন্দর কোনো একটা বালিকা। খুব অল্প বয়স—পনের কিংবা ষোল। ছটফটে ধরনের একজন বালিকা, যে কথায় কথায় রাগ করবে। কথায় কথায় হাসবে। স্বামীর কোনো কথায় অভিমান করে ছাদে চলে যাবে। মুখ ঢেকে কাঁদবে। বৃষ্টির রাতে দুজনে ভিজবে। রাতের পর রাত পার করে দেবে গল্প করে। তিনি দূর থেকে দেখবেন। মুগ্ধ তরুণ তরুণীর ভালোবাসাবাসির মতো অপূর্ব দৃশ্য আর কিছু আছে?

তাঁর নিজের জীবনে এমন কিছু ঘটেনি। তাঁর স্বামী এস. ইয়াজউদ্দিন অনেকটাই রোবটের মতো। যিনি রাত দশটা কুড়ি মিনিটে দাঁত মাজতে যান। দশটা পঁচিশে আধগ্লাস পানি খেয়ে একটা সিগারেট ধরান। গুনে গুনে দশবার সিগারেট টেনে দশটা তিরিশ মিনিটে বলেন—রেহানা ঘুমিয়ে পড়ি? তুমি কি শোবে, না দেরী হবে?

এই রোবট-মানব কোনোদিন বৃষ্টিতে ভেজেন না।

বৃষ্টির পানি গায়ে লাগলেই তাঁর টনসিল ফুলে যায়। জোছনা রাতে কখনো ছাদে যান না। ছাদে উথালপাথাল বাতাস। সেই উথালপাথাল বাতাস গায়ে লাগলেই তাঁর মাথা ধরে।

মানুষটাকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন বলা যেতে পারে। শেষ গন্তব্যের একটা

স্টেশনে সে যাত্রা শুরু করেছে। মাঝ পথে কত না সুন্দর সুন্দর স্টেশন! ট্রেন সেখানে থামছে না। ঝড়ের গতিতে পার হয়ে যাচ্ছে। গন্তব্যের দিকে যতই যাচ্ছে ততই তার গতিবেগ বাড়ছে। আজকাল রেহানার প্রায়ই ইচ্ছা করে কোনো একটা গ্রামের স্টেশন, সিগন্যাল ডাউন করে রেড লাইট জ্বালিয়ে ট্রেনটাকে থামিয়ে দিক। গন্তব্যে যে পৌছতেই হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

'শুভ্র বাবা, এই নাও তোমার চশমা।'

'থ্যাংকস মা।'

'কাল রাতেও তুমি বাতি জ্বালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছ।'

শুভ্র মিটি মিটি হাসল।

'কাল রাত ক'টা পর্যন্ত জেগেছ?'

'ঘড়ি দেখিনি মা। রাত দুইটা কিংবা তিনটা হবে।'

'এমন কি পড়ছিলে যে রাত শেষ করে দিতে হবে?'

'খুব ইন্টারেস্টিং বই... শেষ না করে ঘুমুতে ইচ্ছা করছিল না।'

'ফিজিক্সের কোন বই?'

'উহুঁ। লাভ স্টোরি।'

'এসো নাশতা খেতে এসো।'

নাশতার টেবিলটা তিন জনের জন্যে বিশাল। ছোট আরেকটা টেবিল আছে, ইয়াজউদ্দিন সাহেবের সেই টেবিলটা পছন্দ নয়। দিনের মধ্যে একবারই তিনি শুধু সবার সঙ্গে বসেন—সেটা সকালের নাশতার সময়। বিশাল টেবিলের এক প্রান্তে তাঁর নির্দিষ্ট বসার চেয়ার আছে। মা এবং ছেলে বসে মুখোমুখি। ইয়াজউদ্দিন সাহেব নাশতা খেতে খেতে গল্প করেন। অল্প খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে মনে হয়—মানুষটা বোধ হয় রোবট নয়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেবের প্রিয় খাবার এক বাটি মটরশুটি সিদ্ধ করে তাঁর সামনে দেয়া হয়েছে। খোসা ছাড়িয়ে তিনি মটরশুটি খাচ্ছেন। তাঁর ঠিক সামনে টি-পটে এক পট চা, মোট তিন কাপ চা আছে। নাশতার টেবিলে তিনি আড়াই কাপের মতো খাবেন। তিনি চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, শুভ্র তোমার কি খবর?

শুভ্র হাসল, কিছু বলল না।

তিনি রেহানার দিকে তাকিয়ে বললেন, রেহানা শুভ্রকে আজ প্রিন্সের মতো লাগছে না?

রেহানা বললেন, লাগছে। তবে...

'আবার তবে কি? তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে?'

'না।'

'তা হলে 'তবে' বললে কেন?'

'তুমি তো আমাকে কথা শেষ করতে দাও নি। কথা শেষ করতে দিলে তবে কেন বলেছি তা এক্সপ্লেইন করতাম।'

'সরি, কথা শেষ কর...'

তবে বলেছি কারণ শুভ্রর সবচে সুন্দর জিনিস তার চোখ। চশমার জন্যে তার চোখ কখনো দেখা যায় না। It's a pity.

শুভ্র বলল, মা চুপ করতো। এই টপিকটা আমার কখনো ভালো লাগে না।

ইয়াজউদ্দিন বললেন, মানুষ হয়ে জন্মানোর সবচে বড় সমস্যা কি জান শুভ্র? যে টপিকটি সে পছন্দ করে না তাকেই সেই টপিকটি সবচে বেশি শুনতে হয়। আমার কথাই ধর—পলিটিক্সে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। আমাকে সারাক্ষণ সেই পলিটিক্সের কথা শুনতে হয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে শিল্পমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী এই জাতীয় কোন দপ্তর আমাকে নিতে হতে পারে। রেহানা কি বলছি, শুনছ?

'শুনছি।'

'এই বিষয়ে তোমার কোনো মতামত আছে?'

'না।'

'তুমি কি চাও যে আমি পলিটিক্সে ইন্‌ভল্‌ভড হই?'

'তোমার কাছে আমি কিছুই চাই না।'

'এ রকম উঁচুগলায় কথা বলছ কেন? আমি চাই চায়ের টেবিলে সব সময় লাইভলি ডিসকাশন হবে।'

'তোমার চাওয়া মত পৃথিবী চলবে এটাই বা ভাবছ কেন? আমার চাওয়ারও তো কিছু থাকতে পারে?'

'একটু আগে বলেছ আমার কাছে তোমার কিছু চাওয়ার নেই। তুমি কি নিজেকেই নিজে কন্ট্রাডিক্ট করছ না?'

রেহানা কিছু বললেন না।

ইয়াজউদ্দিন দ্বিতীয় কাপ চা ঢালতে ঢালতে বললেন, রেহানা আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসো না। তর্কে হারবে, মন খারাপ করবে। তর্কে হেরে যাওয়া খুবই অপমানজনক ব্যাপার।

রেহানা টেবিল ছেড়ে উঠে গেলেন।

ইয়াজউদ্দিন শুভ্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার মা'কে তোমার কাছে

কেমন লাগে শুভ্র?

'ভালো।'

'আরো গুছিয়ে বল। সাধারণ একটা এডজেকটিভ দিয়ে তো কিছু বোঝা যায় না। একশ নম্বর যদি থাকে তা হলে তুমি তোমার মাকে কত দেবে?'

'বিরানব্বুই থেকে তিরানব্বুই দেব।'

'আমাকে কত দেবে?'

'বললে তোমার হয়ত মন খারাপ হবে।'

'এত সহজে আমার মন খারাপ হয় না।'

'তোমাকে আমি দেব পঁয়তাল্লিশ।'

'তোমার ধারণা তোমার জাজমেন্ট ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

'শুভ্র এত কম নাম্বার আমি কিন্তু ডিজার্ভ করি না।'

'তুমি মন খারাপ করেছ বাবা। একটু আগে বলেছ তুমি মন খারাপ কর না।'

'মন খারাপ করি না এমন কথা বলিনি। বলেছি—এত সহজে মন খারাপ করি না। তুমি যে কথা বলছ তা সহজ না। এখন তুমি বুঝতে পারছ না। যে দিন বাবা হবে এবং যে দিন তোমার মুখের উপর তোমার ছেলে তোমাকে ফর্টি ফাইভ নাম্বার দেবে সেদিন বুঝবে।'

'বাবা, আমি তোমাকে হার্ট করেছি। আই এ্যাম সরি।'

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি যতটা হার্ট হয়েছি বলে দেখাচ্ছি ততটা হই নি। কারণ আমি জানি তুমি আমাকে ঠিকমতো জাজ কর নি।

'আমার জাজমেন্টে তেমন কিছু যায় আসে না।'

'তা-ও সত্যি। তুমি এখনো এক জন বালক। তোমার বয়স বাইশ হয়েছে আমি জানি—কিন্তু এখনো বালক স্বভাব ত্যাগ করতে পার নি। আশে-পাশের জগৎ সম্পর্কে, মানুষ সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। তোমার জগৎ হচ্ছে তোমার শোবার ঘর, তোমার পড়ার ঘর এবং এই বাড়ি এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

শুভ্র তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। ভারী কাঁচের আড়ালে তার চোখ। কাজেই শুভ্র কি ভাবছে বা কি ভাবছে না কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সে ভয় পাচ্ছে না—খানিকটা মজা লাগছে। বাবাকে এর আগে সে কখনো এমন রেগে যেতে দেখে নি।

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'তুমি কি সাইকেল চালাতে জান?'

'না।'

'না কেন বল তো?'

'এ বাড়িতে তো কোন সাইকেল ছিল না, কাজেই...'

'এ বাড়িতে তো গাড়ি আছে। গাড়ি চালাতে পার?'

'না।'

'সাঁতার জান?'

'না।'

'তুমি কিন্তু কিছুই জান না। তোমার জগৎ—অভিজ্ঞতা শূন্য ক্ষুদ্র জগৎ।'

'একেবারে ক্ষুদ্রও না। আমি প্রচুর পড়ি। বই পড়ে আমি লেখকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে নেই।'

'ধার করা অভিজ্ঞতা কোনো অভিজ্ঞতা না।'

'তুমি কি আমার উপর খুব রাগ করেছ?'

'না, রাগ করি নি।'

'তাহলে এতসব কঠিন কঠিন কথা কেন বলছ? তোমাকে মাত্র পঁয়তাল্লিশ নাম্বার দিয়েছি বলে বলছ?'

'না। তুমি যদি আমাকে পঁচানব্বুইও দিতে তাহলেও বলতাম। আগের থেকে প্ল্যান না করে আমি কিছু করি না। আজ সারাদিনে আমি কি কি করব তা এই কার্ডে লেখা আছে। দুই নাম্বারে কি লেখা একটু পড়ে দেখ।'

শুভ্র পড়ল।

দুইনম্বরে লেখা—"শুভ্র'র সঙ্গে তার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলা।"

'আমার কথা বিশ্বাস হলো শুভ্র?'

'তুমি আমার ভ্রমণ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলছ না—।'

'যা বলছি তা হলো প্রিলগ। মূল গানের আগে তবলার ঠুকঠাক হয়। এ হচ্ছে তবলার ঠুকঠাক। তোমার মাকে ডেকে নিয়ে এস। দুইজনের সামনেই কথা বলি।'

'মা কি আসবে?'

'না আসারই সম্ভাবনা। তবু বলে দেখ।'

রেহানা এসে বসলেন। স্বামীর দিকে একবারও তাকালেন না। তাঁর মুখ কঠিন। তিনি ছোট ছোট করে শ্বাস ফেলছেন।

ইয়াজউদ্দিন তাঁর চেয়ার ছেড়ে স্ত্রীর পাশের চেয়ারে এসে বসলেন। রেহানা আরো শক্ত হয়ে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন স্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ছেলের চোখে চোখ রেখে বললেন, তোমার সঙ্গে কথা বলে আমি আরাম পাই না। কথা বলার

সময় আমি তোমার চোখ দেখতে পাই না।

'বাবা, চশমা খুলে ফেলব?'

'না, তার দরকার নেই। তোমার মা গত রাতে তোমাদের এক পরিকল্পনার কথা বলছিলেন—তোমরা কয়েক বন্ধু না-কি সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে জোছনা রাত কাটাবে?'

'হ্যাঁ।'

'খুবই ভালো কথা, কিন্তু আমার তো ধারণা তোমার কোনো বন্ধু-বান্ধব নেই।'

'স্কুলে ওদের সঙ্গে পড়েছি।'

'স্কুলের পরেও যোগাযোগ ছিল?'

'খুব কম। মাঝে মধ্যে আসত।'

'আমার মনে হয় কোনো ধার টারের প্রয়োজন হলে ওরা তোমার কাছে আসে।'

শুভ্র কোনো জবাব দিল না।

তিনি গলার স্বর স্বাভাবিকের চেয়ে এক ধাপ নীচে নামিয়ে বললেন, শুভ্র, দেশে এখন যে আন্দোলন চলছে—সেই বিষয়ে তোমার মত কি? গণতন্ত্রের আন্দোলনের কথা বলছি।

শুভ্র বুঝতে পারল না—বাবা কেন হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টালেন। সে কোনো জবাব দেয়ার আগেই ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, গোটা আন্দোলনে তুমি একদিনও বের হওনি। ছাত্ররা মিটিং মিছিল করেছে, কার্ফূ ভেঙ্গেছে, গুলি খেয়ে মরেছে—তুমি দরজা বন্ধ করে ঘরে বসেছিলে। কেন জানতে পারি?

'আন্দোলনে যাওয়া তোমরা পছন্দ করতে না। আমি ওদের সঙ্গে যোগ করলে তোমরা রাগ করতে। আমি তোমাদের রাগাতে চাই নি।'

'ঠিকই বলেছ, রাগ করতাম। আন্দোলন সবাইকেই করতে হবে তা না। তোমাকে তৈরী থাকতে হবে আরো বড় কাজের জন্যে...'

শুভ্র হঠাৎ বাবাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, দেশে গণতন্ত্র আনার জন্যে আন্দোলন কি ছোট কাজ?'

তিনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। তাঁকে খানিকটা বিরক্ত মনে হলো। চোখের নিচের চামড়া একটু যেন কুঁচকে গেল। কপালে ভাজ পড়ল। অবশ্যি খুব সহজেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব স্ত্রীর দিকে তাকালেন, দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে হাতঘড়ি দেখলেন। এখনো তাঁর হাতে কুড়ি মিনিট সময় আছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলতে

কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না। শুভ্র কথার পিঠে কথা বলে না। কথার পিঠে কথা বললে আরো বেশি সময় লাগতো।

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'তোমার এই বন্ধুরা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে, তাই না?

'জ্বি।'

'সাধারণত হাইলি রোমান্টিক পরিকল্পনা মিডল ক্লাস ফ্যামিলির ছেলে-মেয়েদের মাথায় আসে। এই নিয়ে মাসের পর মাস তারা আলোচনা করে। প্ল্যান প্রোগ্রাম হয়, তার পর এক সময় সব ভেস্তে যায়। বেশির ভাগ সময়ই ভাঙে অর্থনৈতিক কারণে। আশা করি তোমাদেরটা ভাঙবে না।'

'না ভাঙবে না। আসছে মঙ্গলবার আমরা রওনা হচ্ছি। শুক্রবার পূর্ণিমা। আমরা সেন্ট মার্টিনে গিয়েই পূর্ণিমা পাব।'

'ভেরী গুড। চাঁদের আলোয় দ্বীপে ঘুরাঘুরি করবে?'

'জ্বি।'

'ইন্টারেস্টিং। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, যাদের সঙ্গে যাচ্ছ তারা কি তোমার ভালো বন্ধু?'

'ওরা আমাকে খুব পছন্দ করে।'

'আমার মনে হয় তুমি ভুল বলছ। ওরা তোমার অর্থ বিত্ত এইসব পছন্দ করে। তোমার মধ্যে পছন্দ করার মতো গুণাবলি বিশেষ নেই। তুমি মজার গল্প করতে পার না। আসর জমাতে পার না। তুমি অত্যন্ত ইন্ট্রোভার্ট ধরনের এক জন যুবক—যে এখনো বালকের খোলস ছাড়তে পারে নি।'

'তুমি কি আমাকে যেতে নিষেধ করছ?'

'না। তোমার বয়স বাইশ, তুমি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছামত চলতে পার। আমি শুধু সমস্যাগুলোর প্রতি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রথমেই বলছি ভ্রমণ পরিকল্পনা কাগজে কলমে যতটা ইন্টারেস্টিং বাস্তবে কখনোই তত ইন্টারেস্টিং হয় না। দ্বীপে পৌছতে তোমাদের খুব কষ্ট করতে হবে—এত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নেই। দ্বীপে পৌছার পর শীতে কাবু হবে। বাথরুমের অভাবে কাবু হবে। তুমি হঠাৎ অবাক হয়ে লক্ষ্য করবে তোমার বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গও ততটা ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে না। তারা অশ্লীল সব রসিকতা করবে। তুমি তা-ও সহ্য করতে পারবে না।'

'তুমি মনে করছ আমার যাওয়া উচিত নয়?'

'অবশ্যই তোমার যাওয়া উচিত। ছোট্ট একটা প্রবাল দ্বীপ। চারপাশে সমুদ্র,

আকাশে Full moon—খুবই একসাইটিং। তুমি যাবে তো বটেই। তুমি তোমার মতো করে যাবে। আমি কক্সবাজারের ডিসি সাহেবকে টেলিফোন করে দেব। এ ছাড়াও আরো কিছু লোকজনকে বলব যাতে—টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিনে যাবার জন্যে ভালো জলযান থাকে। দ্বীপে চোর ডাকাত থাকতে পারে। কাজেই সঙ্গে পুলিশ দরকার। খাবার দাবারের ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। ক্ষুধা পেটে পূর্ণিমার চাঁদকে রুটির মতো লাগে। কার কথা যেন এটা?'

'সুকান্ত'র।'

অবিকল এই রকম একটা কবিতার লাইন ইংরেজি কবিতায়ও পড়েছি—Give me some salt, I will eat the moon...পড়েছ এই কবিতা?"

'না।'

'ইংরেজি কবিতা তুমি পড় না?'

'না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠতে উঠতে বললেন—তুমি আজকের দিনটা চিন্তা কর। কাল সকালে আমাকে বলবে কি করতে চাও। যা করতে চাও তাই হবে। বাইশ বছরের যুবক ছেলের উপর আমি কিছুই ইম্পোজ করতে চাই না। অবশ্যি আরেকটি ব্যাপারও আছে। দেশের সব মানুষ যেখানে গণতন্ত্রের জন্যে আন্দোলন করছে সেখানে তোমরা মজা করার জন্যে বেড়াতে যাচ্ছ এটা কেমন কথা?

রেহানা বললেন, শুভ্র কখনোই কিছু চায় না। হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে—ঘুরে আসুক না।

ইয়াজউদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন, ওর কথা ওকেই বলতে দাও। শুভ্র, তুমি কি যেতে চাও?

শুভ্র বলল, না। বলেই দ্রুত নিজের ঘরের দিকে চলে গেল। তার চোখে পানি এসে গেছে। বাবা-মা'কে সে চোখের পানি দেখাতে চায় না।

ইয়াজউদ্দিন হাতের ঘড়ি দেখলেন। বিশ মিনিট পার হয়েছে। তিনি উঠে পড়লেন। রেহানাকে বললেন, ও মন খারাপ করে 'না' বলেছে। ওকে যেতে বল। ঘুরে আসুক। পৃথিবীর রিয়েলিটির সঙ্গে খানিকটা পরিচয় হোক।

২

সঞ্জু বারান্দায় পাটি পেতে খেতে বসেছে।

তাকে দেখেই মনে হচ্ছে সে খুব ক্ষুধার্ত। বড় বড় নলা বানিয়ে মুখে দিচ্ছে। সঞ্জুর মা ফরিদা তাঁর সামনেই বসে আছেন। অন্য দিন সঞ্জু খেতে খেতে গল্প করে আজ তাও করছে না।

ফরিদা অস্বস্তি বোধ করছেন। দ্রুত শূন্য হয়ে আসা থালার দিকে তিনি ভীত চোখে তাকিয়ে আছেন। ভাত আর নেই। থালার ভাত শেষ হয়ে গেলে আর দেয়া যাবে না। ছেলেটা কি ক্ষিধে-পেটে উঠবে? আজ ভাত কম পড়ল কেন? তিনি নিজে মেপে-মেপে সাড়ে চার পট চাল দিয়েছেন।

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি খেয়েছ মা?

তিনি ক্ষীণ গলায় বলল, হুঁ।

এটা বলতেও তাঁর লজ্জার সীমা রইল না। ফরিদা ক্ষিদে সহ্য করতে পারেন না। একেবারেই না। রান্না হওয়া মাত্র গরম গরম ভাত খেয়ে নেন। তখনো হয়ত তরকারি হয় নি, ডালটা শুধু নেমেছে।

সঞ্জুর ভাতের থালা প্রায় শূন্য। এক্ষুণি হয়ত সে বলবে—আর চারটা ভাত দাওতো মা। ফরিদা মনে মনে বললেন, আল্লাহ্ আজ যেন সে ভাত না চায়। খাওয়া শেষ করে যেন উঠে পড়ে।

সঞ্জু ভাত শেষ করে ফেলেছে। পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে। ফরিদা চাপা স্বরে বললেন, খাওয়া হয়ে গেল?

'হুঁ।'

'আর চারটা ভাত নিবি না?'

'না। পান থাকলে একটা পান দাওতো মা।'

ফরিদা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, তোরতো দেখি পান খাওয়া অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। তুই ছাত্র মানুষ। তোর কি দাঁত লাল করে পান খাওয়া ঠিক?'

'ঠিক না হলে দিও না।'

সঞ্জু হাত ধুতে উঠে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত ধুচ্ছে। মুখ ভর্তি করে পানি নিয়ে কুলি করে কলঘরের কাছে রাখা টবে ফেলার চেষ্টা করছে। ছেলেবেলার অভ্যাস। সব ভাই-বোন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কুলি করে টবে পানি ফেলার চেষ্টা করবে। কুলির পানিতে উঠান মাখামাখি। কত বকা দিয়েছেন লাভ হয় নি। দশ বছর আগের টব এখনো আছে। গাছ বদল হয়েছে। শুরুতে ছিল গোলাপ গাছ, তার পর কয়েক বছর মরিচের গাছ, একবার ছিল টমেটোর গাছ—খুব টমেটো হয়েছিল সেবার। এখন আবার একটা গোলাপ গাছ। গাছ ভর্তি করে কলি এসেছে। এখনো ফুল ফোটেনি।

'সঞ্জু পান নে।'

সঞ্জু পান হাতে নিতে নিতে বলল, ভাত যদি চাইতাম তা হলে মা তুমি বিপদে পড়তে। ভাততো আর ছিল না।

ফরিদা বিব্রত গলায় বললেন, কে বলল ছিল না?

'আমি বুঝতে পারি।'

'ইস কি আমার বুঝনেওয়ালা—আয় রান্নাঘরে নিজের চোখে দেখে যা।'

সঞ্জু হাসতে হাসতে বলল, এম্নি বললাম।

ফরিদা মুগ্ধ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সঞ্জু হাসলেই তার গালে টোল পড়ে। দেখতে এমন মজা লাগে। ইচ্ছা করে হাত দিয়ে ছুঁয়ে দিতে। গালে টোল-পড়া মেয়েরা দুর্ভাগ্যবতী হয়, ছেলেদের বেলায় কি এসব কিছু আছে?

'দশটা টাকা দিতে পারবে মা?'

'সকালে না পাঁচ টাকা নিলি।'

'ঐটা বাস ভাড়াতেই শেষ। এখন যাব আদাবর, ফিরতে ফিরতে রাত এগারটা।'

'এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবি?'

'উপায় কি মা। ফাইন্যাল প্ল্যানিং করতে হবে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্লু প্রিন্ট আজ রাতে তৈরী হবে। আমাদের এই প্রজেক্টের নাম কি জান? প্রজেক্টের নাম হচ্ছে—প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ।'

'দারুচিনি দ্বীপ কেন?'

রোমান্টিক ধরনের একটা নাম দেয়া হল—এই আর কি? দুইটা নাম সিলেকটেড হয়েছিল—"প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ এবং "প্রজেক্ট কালাপানি"। লটারীতে দারুচিনি দ্বীপ উঠে এল। এটা আমার দেয়া নাম।

ফরিদা হালকা গলায় বললেন, কি যে তোদের কাণ্ডকারখানা। বেড়াতে যাবি তার আবার একটা না—প্রজেক্ট হেন, প্রজেক্ট তেন...'

'এইসব তোমরা বুঝবে না মা। আর শুধু বেড়াতে যাচ্ছি তাতো না আরো ব্যাপার আছে।'

'আর কি ব্যাপার?'

'তোমাকে বলা যাবে না।'

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, টাকা দিতে হবে মনে আছে তো মা?

'মনে আছে।'

'এক হাজার টাকা। সবাই মিনিমাম এক হাজার নিচ্ছে। দিতে পারবে তো?'

'পারব।'

'লাষ্ট মোমেন্টে যদি বল—টাকার জোগাড় হয় নি। তাহলে সর্বনাশ।'

'ক'জন যাচ্ছিস?'

'এখনো ঠিক হয় নি। আজ ফাইন্যাল হবে। ইয়ে মা শোন—আমাদের সঙ্গে

কয়েকটা মেয়েও হয়ত যাবে।'

'কি বললি?'

'ওরা যেতে চাচ্ছে। আমরা নিব কি-না এখনো ঠিক করিনি। নাও নিতে পারি। ওদের নেয়া মানেই যন্ত্রণা।'

ফরিদা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।

সঞ্জু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি এমন করে তাকিয়ে আছ কেন? মেয়েরা সঙ্গে গেলে কি অসুবিধা। ওরা আমাদের বন্ধুর মতো। এক সঙ্গে পড়ি। ওরাতো এখন ষ্টাডি ট্যুরে যায়, একস্‌কারসানে যায়। ছেলেদের সঙ্গেই তো যায়।

'তখন তোদের স্যাররা সঙ্গে থাকেন। এখন যাচ্ছিস নিজেরা নিজেরা।'

'তাতে কি?'

'মেয়েগুলোর বাপ-মা যেতে দেবে?'

'দিবে না কেন?'

একটা প্রশ্ন ফরিদার মুখে চলে এসেছিল তিনি চট করে নিজেকে সামলে নিলেন। প্রশ্নটা করলে সঞ্জু যদি আবার কিছু মনে করে। যদি লজ্জা পায়। প্রশ্নটা হলো মেয়েগুলোর মধ্যে তোর পছন্দের কেউ আছে?

ফরিদার ধারণা আছে। তাঁর এত সুন্দর রাজপুত্রের মতো ছেলে। মেয়েদের অনেকেই নিশ্চয়ই আগ্রহ করে তার কাছে আসে ভাব করার জন্যে। এদের কাউকে কি সঞ্জু অন্যদের চেয়ে আলাদা চোখে দেখে না? দেখাটাই তো স্বাভাবিক।

একবার তিনি সঞ্জুর বইখাতা গুছাচ্ছেন, হঠাৎ সেখান থেকে নীল রঙের একটা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। তিনি পড়বেন না পড়বেন না ভেবেও শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললেন। রিংকু নামে একটা মেয়ে লিখেছে। সুন্দর গোটা গোটা হাতের লেখা, তবে খুবই ছোট দুই লাইনের চিঠি।

সঞ্জু,

তুমি আমাকে এমন বোকা বানালে কেন?

আমি ভীষণ, ভীষণ, ভীষণ রাগ করেছি।

ইতি রাগান্বিতা

রিংকু

ফরিদার খুব ইচ্ছা করছিল রিংকুকে সঞ্জু কি করে বোকা বানিয়েছিল সেটা জানতে। জানা হয় নি। লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারেন নি। তাছাড়া জিজ্ঞেস করলে সঞ্জু যদি বলে—মা, তুমি বুঝি লুকিয়ে আমার চিঠি পড়?

রাগান্বিতা রিংকুর দু'লাইনের চিঠি পড়ে ফরিদার খুবই ভালো লেগেছিল। চিঠি হবে এ রকম—এক লাইনের দুই লাইনের, চট করে ফুরিয়ে যাবে।

তারপরও মনে হবে ফুরাল না। রহস্য থেকে গেল। অবশ্যি রিংকুর চিঠির সম্বোধন তাঁর পছন্দ হয় নি। নাম ধরে লিখবে কেন? কত সুন্দর সুন্দর সম্বোধন আছে—সুপ্রিয়, সুজনেষু, দেবেষু...।

সঞ্জু বলল, টাকাটা দাও মা চলে যাই।

ফরিদা টাকা এনে দিলেন এবং মুখ ফসকে বলে ফেললেন, রিংকু কি তোদের সঙ্গে যাচ্ছে?

সঞ্জু অবাক হয়ে বলল, রিংকু কে?

ফরিদা কি বলবেন ভেবে পেলেন না। সঞ্জু আবার বলল, কোন রিংকুর কথা বলছ? তিন জন রিংকু আছে আমাদের সঙ্গে। এক জন অনার্সে, দুই জন সাবসিডিয়ারী ক্লাসে।

ফরিদা দারুণ অস্বস্তি নিয়ে বললেন, ঐ যে মেয়েটা তোকে চিঠি লিখেছিল—দুই লাইনের। তোর বই গুছাতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম।

'ও আচ্ছা বুঝেছি—সাবসিডিয়ারীর রিংকু। ওর সয়েল সায়েন্সে অনার্স। সাবসিডিয়ারীতে দেখা হয়। ফাজিলের চূড়ান্ত। না ও যাচ্ছে না। ও যাবে কেন?'

'মেয়েটা কেমন?'

'বললাম না, ফাজিল ধরনের। সবার সাথে ফাজলামী করে। স্যারদের সাথেও।'

'চেহারা কেমন?'

'চেহারা মন্দ না। নাক বোঁচা, আমরা তাকে ডাকি মিস খ্যাঁদা। ও মোটেই ক্ষেপে না। উল্টা হাসে। ও কি বলে জান মা? ও বলে আগে না-কি ওর নাক গ্রীকদের মত খাড়া ছিল। কলেজে উঠার পর চাইনীজ খাওয়া ধরেছে। প্রতি সপ্তাহে একদিন করে চাইনীজ খায়। এই জন্যেই তার নাক চাইনীজদের নাকের মতো হয়ে যাচ্ছে। ও বলে, সঞ্জু, খুব চিন্তায় আছি নাক যে ভাবে বসে যাচ্ছে কোনদিন দেখব ফুটো বন্ধ হয়ে গেছে। তখন নিঃশ্বাস ফেলব কি করে?

ফরিদা বললেন, তোকে নাম ধরে ডাকে?

'নাম ধরে ডাকবে না? আমরা এক সঙ্গে পড়ি না?'

সঞ্জু মা'র দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলল, রিংকুর বিয়ের কথা হচ্ছে। মার্চে বিয়ে হয়ে যাবে। সে কি বলেছে জান? বলেছে আমার সঙ্গে যাদের যাদের প্রেম করার ইচ্ছা তাদের জরুরী ভিত্তিতে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা যেন মার্চের আগেই তা করে ফেলে।

ফরিদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

দিনকাল বদলাচ্ছে। তবে বড় বেশি দ্রুত বদলাচ্ছে। এত দ্রুত বদলানো কি

ভালো? রিংকু মেয়েটার কাণ্ডকারখানা একই সঙ্গে তাঁর ভালো লাগছে, আবার ভালো লাগছে না।

'মা যাই। অনেকক্ষণ তোমার সাথে বক বক করলাম। রাতে কিন্তু ফিরতে দেরী হবে।'

'বেশি দেরী করলে তোর বাবা রাগ করবে।'

'বাবাকে খাইয়ে দাইয়ে ন'টার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে দিও।'

সঞ্জুর বাবা সোবাহান সাহেব এজি অফিসে কাজ করেন।

সেকশান অফিসার।

আজ দুপুরে বাসায় চলে এসেছেন। লাঞ্চ খাবার পর হঠাৎ কেন জানি তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল। বমি বমি ভাব হতে লাগল। বাসায় এসে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিলেন। এখন শরীর ভালো লাগছে। বাসায় ফেরার পথে দুইটা খবরের কাগজ কিনেছিলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সারা দুপুর তাই পড়ছেন। খবরের কাগজ পড়া তাঁর নেশার মতো। আগে একটা কাগজ রাখা হত। খরচে পুষাচ্ছে না বলে গত তিন মাস ধরে রাখা হচ্ছে না। তবে প্রায়ই খবরের কাগজ কেনা হচ্ছে। আজ যেমন কেনা হলো। না কিনে করবেনই বা কি? আমেরিকা—ইরাকের যুদ্ধের খবর পাবেন কোথায়? গোড়াতে তিনি ধরে নিয়েছিলেন সাদ্দাম লোকটা মহা গাধা। গাধা না হলে আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করে? এখন দেখা যাচ্ছে লোকটাকে যতটা গাধা মনে হয়েছিল ততটা গাধা না। সাত দিন তো যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে গেল। আমেরিকার সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ চালিয়ে নিয়ে যাওয়াতো সোজা ব্যাপার না। মুসলমান হলো, মাথা গরমের জাত—এই লোকটার দেখা যায় মাথা ঠাণ্ডা।

ফরিদা শোবার ঘরে ঢোকামাত্র সোবাহান সাহেব বললেন, ফরিদা এক কাপ চা দাও তো।

'চায়ের সাথে আর কিছু খাবে? মুড়ি আছে। দিব?'

'দাও। আর শোন, মানিব্যাগ থেকে টাকা নিয়ে কাকে দিলে, সঞ্জুকে?'

'হ্যাঁ।'

'অভ্যাস খারাপ করে দিচ্ছ। টাকা চাইলেই দিবে?'

'দশটা মোটে টাকা।'

'দশ টাকা মোটেই সামান্য না। দশ দিন যদি দশ টাকা করে দাও তা হলে কত হয়? একশ। একশ টাকায় দশ সের চাল পাওয়া যায়। তার উপর যুদ্ধ লেগে গেছে—থার্ড ওয়ার্ল্ড-ওয়ার। সারা পৃথিবীর অবস্থা কাহিল।'

'এইখানে তো আর যুদ্ধ হচ্ছে না।'

'না বুঝে কথা বলবে না। যুদ্ধের এফেক্ট সারা পৃথিবীতে পড়বে। অলরেডি পড়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কোথায় হয়েছিল? ইউরোপে। লোক মারা গেল কোথায়? বাংলাদেশে। লাখ লাখ লোক। এক জন দুই জন না। এইবার মারা যাবে কোটিতে।'

ফরিদা বললেন, যাই তোমার চা নিয়ে আসি।

'কথা শেষ করে নেই তারপর যাও। বস।'

ফরিদা বসলেন। শংকিত মনেই বসলেন। এই মানুষটার বক্তৃতা দেয়ার অভ্যাস আছে। একবার বক্তৃতা শুরু হলে ঘণ্টা খানিক চলবে। প্রতিটি কথা শুনতে হবে খুব মন দিয়ে। কথার মাঝখানে এদিক ওদিক তাকালেই মানুষটা রেগে যায়। অবশ্য বক্তৃতা সে শুধু তাঁর সঙ্গেই দেয় অন্য কারো সঙ্গে একটি কথাও বলে না।

সোবাহান সাহেব, খবরের কাগজ নামিয়ে রেখে গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মেয়েরা কোথায়?

'মুনার বান্ধবীর জন্মদিন। সে দুই বোনকে নিয়ে ঐখানে গেছে। ওরা গাড়ি দিয়ে নিয়ে গেছে। রাতে সেখানে খাবে তারপর গাড়ি করে দিয়ে যাবে।'

'গাড়ি করে নিয়ে যাক আর হেলিকপ্টারে করেই নিয়ে যাক—যার বান্ধবীর দাওয়াত সে যাবে। গুষ্টিশুদ্ধো যাবে কেন? এইসব আমার পছন্দ না।'

'মাঝে মাঝে একটু-আধটু বেড়াতে গেলে কি অসুবিধা?'

'অসুবিধা আছে। এতে পাড়া-বেড়ানি অভ্যাস হয়। দিন-রাত খালি ঘুর-ঘুর করতে ইচ্ছা করে। মেয়েদের জন্যে এটা ভালো না। আমাদের অফিসের করিম সাহেবের এক ছোটশালি বি.এ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। তার এ রকম পাড়া-বেড়ানি স্বভাব। হুট হাট করে এখানে যায়, ওখানে যায়। এক দিন কোন বন্ধুর খোঁজে দুপুরে ছেলেদের এক হোস্টেলে গিয়ে উপস্থিত... তারপর থাক বাকিটা আর বলতে চাই না...'

'শুনি না তারপর কি?'

'না থাক। সব কিছু শোনা ভালো না। যাও চা-টা নিয়ে আস।'

চা এনে ফরিদা দেখলেন, মানুষটা বমি করে সমস্ত ঘর ভাসিয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বিছানায় বসে আছে। চোখ রক্তবর্ণ। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে।

ফরিদা ভীত গলায় বললেন, কি হয়েছে?

সোবাহান সাহেব প্রায় অস্পষ্ট গলায় বললেন, শরীরটা খুব খারাপ লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে।

'সে কি!'

তিনি পেটে হাত দিয়ে আবার বমি করলেন।

এই কঠিন গম্ভীর মানুষটা অসুখ-বিসুখ একেবারেই সহ্য করতে পারে না। অল্প শরীর খারাপেই শিশুর মতো হয়ে যায়। আজ শরীরটা বেশি রকম খারাপ। ফরিদা হাত-মুখ ধুইয়ে তাঁকে মেয়েদের বিছানায় শুইয়ে দিয়ে এসেছেন। নিজের শোবার ঘর ধুয়ে মুছে মেয়েদের ঘরে যখন ঢুকলেন তখন সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। সোবাহান সাহেব কম্বল গায়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছেন। তাঁর গায়ে জ্বর। অন্ধকার ঘরে ভন ভন করে মশা উড়ছে। ফরিদা মশারী খাটিয়ে স্বামীর বিছানায় উঠে এলেন। কোমল গলায় বললেন, শরীরটা কি বেশি খারাপ লাগছে?

'হুঁ।'

ফরিদা স্বামীর মাথা কোলে তুলে নিলেন। মায়ায় তাঁর মনটা ভরে যাচ্ছে। মানুষটাকে এখন একেবারে শিশুর মতো লাগছে। কোলে মুখ গুঁজে চুপচাপ পড়ে আছে। একটু নড়ছেও না।

'শরীর এখন কি একটু ভালো লাগছে?'

'হুঁ।'

'ঘুমুতে চেষ্টা কর। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।'

'আচ্ছা।'

ফরিদা স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে কল্পনায় সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড দেখতে লাগলেন। সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা দ্বীপ। চারদিকের পানি ঘন নীল। যে দিকে তাকানো যায় নীল ছাড়া আর কিছুই নেই। সমুদ্রের নীলের সঙ্গে মিশেছে আকাশের নীল। দ্বীপে কোন জনমানব নেই, গাছপালা নেই। মরুভূমির মতো ধু ধু বালি। জোছনা রাতে সেই বালি চিক চিক করে জ্বলে।

সোবাহান সাহেব অস্পষ্ট স্বরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। ফরিদা বললেন, ঘুম আসছে না?

'না।'

'আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কি গাছপালা আছে?'

'হুঁ আছে।'

'তুমি গেছ কখনো সেখানে?'

'না।'

'তাহলে জান কি করে?'

সোবাহান সাহেব সেই কথার জবাব না দিয়ে উঠে বসলেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমাকে বাথরুমে নিয়ে যাও। আবার বমি আসছে।

তাঁর জ্বর আরো বেড়েছে। চোখ হয়েছে রক্তবর্ণ।

ফরিদা তাঁকে ধরে ধরে বিছানা থেকে নামালেন। সোবাহান সাহেব বিড় বিড় করে বললেন, ঘর একদম খালি। বাচ্চা-কাচ্চারা না থাকলে আমার ভালো লাগে না, এরা কখন আসবে?

'এসে পড়বে।'

'সঞ্জু, সঞ্জু কোথায় গেছে?'

'বন্ধুর বাসায়।'

সন্ধ্যার পর বন্ধুর বাসায় যাওয়া-যাওয়ি আমার পছন্দ না।'

'রোজ তো যায় না। মাঝে-মধ্যে জরুরী কাজ থাকলে যায়।'

'কি জরুরী কাজ?'

ফরিদা চুপ করে রইলেন। সোবাহান সাহেব বললেন, বমি ভাবটা চলে গেছে। আমাকে শুইয়ে দাও।

'মাথায় পানি ঢালব? অনেক জ্বর।'

'পানি ঢালতে হবে না।'

তিনি আবার বিছানায় কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়েপড়লেন। একটি কম্বলে শীত মানছে না। গায়ের উপর আরেকটা লেপ দেয়া হলো। পায়ে মোজা পরিয়ে দিয়ে ফরিদা শংকিত মনে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এক জন ডাক্তারকে খবর দেয়া দরকার। কাকে দিয়ে খবর দেয়াবেন? বাড়িওয়ালার ছেলেটাকে বললে সে কি এনে দেবে না?

'ফরিদা?'

'কি।'

'তোমার ছেলে-মেয়েরা আমাকে এত ভয় পায় কেন? আমি কি কখনো এদের গায়ে হাত তুলেছি না উঁচু গলায় কোনো কথা বলেছি?'

'ভয় পায় না।'

'অবশ্যই পায়। কেউ আমাকে একটা কথা এসে বলে না। যা কিছু বলার বলে তোমাকে।'

'চুপ করে শুয়ে থাক।'

'শুয়েই তো আছি। মাঝে মাঝে মনটা খারাপ হয়, ভাবি কি করেছি আমি?'

'গম্ভীর হয়ে থাক, এই জন্যে বোধ হয় একটু দূরে দূরে থাকে।'

'গম্ভীর হয়ে থাকলে অসুবিধা কি? একটা লোক যদি গম্ভীর হয়ে থাকে তাহলে তাকে কি কিছু বলা যাবে না?'

'ওরা ভাবে ওদের কথা শুনলে তুমি রাগ করবে তাই...'

'এটা তো তুমিও ভাব।'

'আমি ভাবব কেন?'

'তুমি যদি না ভাব তাহলে সঞ্জুর জরুরী কথাটা আমাকে বললে না কেন? আমি রাগ করতে পারি এই ভেবেই তো তুমি বলছ না।'

ফরিদা চাপা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, সঞ্জু তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যেতে চায়।

'কোন জায়গায়?'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড।'

'এটা শুনে আমি রাগ করব কেন? রাগ করার এখানে কি আছে? যুবক বয়স, এই বয়সে নানান জায়গায় ঘুরার ইচ্ছা তো হবেই। সঞ্জুর বয়স কত এখন?'

'তেইশ।'

'তেইশ বছর বয়সে আমি একা-একা দার্জিলিং গিয়েছিলাম।'

'আমাকে তো কখনো বল নাই।'

'বাড়ি থেকে রাগ করে চলে গিয়েছিলাম। শুধু বড় মামা জানত। বড় মামা— পাঁচশ টাকা দিয়েছিলেন।'

'রাগ করেছিলে কেন?'

'আমার বাবা ছিল খুব রাগী। রাগলে উনার মাথা ঠিক থাকত না। একবার রেগে গেলেন তারপর সব লোকজনের সামনে জুতোপেটা করলেন।'

'সেকি। এমন কি করেছিলে যে জুতাপেটা করতে হলো। এত বড় ছেলেকে জুতোপেটা করবে এটা একটা কথা হলো। কেমন মানুষ উনি?

'বাবার সম্পর্কে এমন তাচ্ছিল্য করে কথা বলবে না। উনার রাগ ছিল বেশী। রাগ বেশি থাকা অপরাধ না। সঞ্জু যাচ্ছে কবে?'

'এখনো ঠিক হয় নাই। সামনের সপ্তাহে যাবে বোধ হয়।'

'ওর গরম কাপড় তো কিছু নাই। একটা স্যুয়েটার কিনে দিও। আর একটা মাফলার। সমুদ্রের তীরে খুব ঠাণ্ডা হওয়ার কথা। হুঁ হুঁ করে বাতাস। ফট করে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। কানে ঠাণ্ডা লাগে সবার আগে। আমার গরম চাদরটাও দিয়ে দিও।'

'আচ্ছা।'

'দেশ-বিদেশ ঘুরলে মন বড় হয়। কত কি দেখা যায়। শেখা যায়। আমার টাকা-পয়সা নাই। টাকা-পয়সা থাকলে দেশ-বিদেশে পাঠাতাম। দেশের ভেতর এখানে-ওখানে যেতে চায়—যাবে। এটা শুনে আমি রাগ হব কেন?'

ফরিদা স্বামীর মাথার চুল টানতে টানতে বললেন, দার্জিলিং তোমার কাছে কেমন লেগেছিল বল তো?

'ভালো।'

'কেমন ভালো বল। শীতের সময় গিয়েছিলে?'

'হুঁ।'

'খুব শীত না?'

'হুঁ।'

'কতদিন ছিলে দার্জিলিঙে?'

সোবাহান সাহেব জবাব দিলেন না। মনে হলো তার শরীর একটু যেন কেঁপে উঠল। ফরিদা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সোবাহান সাহেবের চোখ ভেজা। তিনি নিঃশব্দে কাঁদছেন।

৩

রানার বড় ভাই-এর বাড়ি আদাবরে।

পাঁচতলা হুলুস্থূল ধরনের বাড়ি। যার একতলার দুটি ইউনিটে রানারা থাকে। বাকি চারতলা ভাড়া দেয়া হয়েছে। রানা মূলত এই বাড়ির এক জন কেয়ারটেকার। পরপর তিনবার ইন্টারমিডিয়েট ফেল করবার পর রানার বড় ভাই—সাদেক আলি রানাকে একদিন ডেকে পাঠান এবং খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বলেন পড়াশোনা তোকে দিয়ে হবে না—তুই বরং ব্যবসাপাতি কর।

রানা সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে এবং খুব নিশ্চিন্ত বোধ করে।

'আজকাল পয়সা হচ্ছে কনস্ট্রাকসনে, ব্রিক ফিল্ড একটা ভালোমতে চালাতে পারলে লাল হয়ে যাবি। পারবি না?'

রানা আবার হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ে।

'আচ্ছা তাহলে তাই করব। পড়াশোনা তোর লাইন না। না-কি আরেকবার পরীক্ষা দিতে চাস? ভেবে বল। লাস্ট চান্স একটা নিবি?'

'না।'

'তিনে যার হয় না চারেও তার হবে না। আচ্ছা যা ব্রিক ফিল্ড একটা করে দেব—ইনশাআল্লাহ।'

এইসব কথা-বার্তা আজ থেকে ন'মাস আগের। রানা মোটামুটি নিশ্চিত যে ব্রিক ফিল্ডের রমরমা দিন তার আসছে। শুধু সময়ের ব্যাপার। গত ন'মাসে বাড়ির কেয়ার টেকারের দায়িত্ব তার ঘাড়ে চেপেছে। সে এই কাজ বেশ মন দিয়ে করছে। তিন তলার ভাড়াটের ইলেকট্রিক ফিউজ জ্বলে গিয়ে ফ্ল্যাট অন্ধকার—রানাকে দেখা যাবে টর্চ লাইট জ্বালিয়ে ফিউজ ঠিক করছে। দুই তলার ভাড়াটে দেয়ালে পেইনটিং বসাবে। মিস্ত্রী ডেকে দেয়ালে ফুটো করার কাজের পুরো

দায়িত্বই তার। এইসব ছাড়াও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তার ডাক পড়ছে। চারতলার ভাড়াটের ছেলের আকিকা। দুটা খাসি আমিন বাজার থেকে কিনে আনা, মৌলানার ব্যবস্থা করা, আওলাদ হোসেন লেন থেকে কিসমত বাবুর্চিকে নিয়ে আসার জটিল সব কাজ সে আনন্দ এবং আগ্রহের সঙ্গে করে।

রানার স্বভাব খুব মধুর। না হেসে কোনো কথা বলতে পারে না। যে যাই বলে তাই সে সমর্থন করে। কোনো ঝগড়া-ঝাটি শুরু হলে মধ্যস্ততার জন্যে অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্কুল এবং কলেজ জীবনের বন্ধুদের জন্যে তার মমতার কোনো সীমা নেই। সে নিজে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু অন্যদের পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে কি না তা নিয়ে তার চিন্তার শেষ নেই। অনার্স ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় সে তার প্রতিটি বন্ধুর পরীক্ষা কেমন হয়েছে তার খোঁজ প্রতিদিন নিয়েছে। মোতালেবের ফোর্থ পেপার খুব খারাপ হয়েছে। পেপার ক্র্যাশ করতে পারে শুনে সে দুঃশ্চিন্তায় রাতে ভালো ঘুমুতেও পারে নি।

রিং রোডের মাঝামাঝি একটা চায়ের রেস্টুরেন্টে রানা বাকির খাতা খুলে রেখেছে। সেই বাকির খাতায় তার চার বন্ধুর নাম লেখা। দোকানদারকে বলা আছে—এই চার জন এবং এই চার জনের সাথে কোন বন্ধু বান্ধব থাকলে তারাও বাকি খেতে পারবে। যা খেতে চায় তাই।

রানার বন্ধুরা এই চায়ের দোকানেই রানার সঙ্গে আড্ডা দেয়। সপ্তাহে অন্তত একদিন বিকাল তিনটা থেকে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। রাত বেশি হয়ে গেলে দোকানেই পাটির উপর ঘুমিয়ে পড়ার ব্যবস্থা আছে। বালিশ এবং এক্সট্রা মশারী রানা বাড়ি থেকে নিয়ে আসে তবে বন্ধুদের কখনো বাড়িতে নিতে পারে না। রানার বড় ভাই পছন্দ করেন না।

আজ চায়ের দোকানে সঞ্জু, তারেক এবং মোতালেব বিকেল পাঁচটা থেকে বসে আছে। রানার খোঁজ নেই। একটা কাজের ছেলে বলে গেছে—এক্ষণ আইব, আপনাগো চা-পানি খাইতে বলছে।

রানার বন্ধুরা ইতিমধ্যে সবাই চার কাপ করে চা খেয়েছে। দশ টাকার পিয়াজু খেয়েছে। ডিমের অমলেট খেয়েছে। প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপ নিয়ে তুমুল আলোচনাও চলছে। তবে পুরোপুরি ফাইন্যাল করা যাচ্ছে না। সবাই একত্র হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে অথচ দুই জন এখনো অনুপস্থিত। রানা এবং বল্টু। বল্টু থাকে বাসাবোতে। সে আসবে একটা টিউশ্যানী শেষ করে। আসতে আসতে ন'টা বাজবে। রানা কেন আসছে না কে জানে। কোন একটা সমস্যা নিশ্চয়ই হয়েছে।

রানার সমস্যা বেশ গুরুতর, তাদের টয়লেটের কমোডে কি যেন হয়েছে, হড় হড় করে পানি বের হয়ে চারদিক ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্লাম্বার এক জনকে আনা

হয়েছে সে খানিকক্ষণ পর পর বিরস মুখে বলছে—কিছুই তো বুঝি না, পানে আহে কোন হান থুন?

সাদেক আলি একতলার বারান্দায় হাঁটাহাটি করছেন এবং গজরাচ্ছেন, গাধাটা করে কি। সামান্য জিনিসও পারে না। পানির মিস্ত্রি আনতে বললাম, রাস্তা থেকে কাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কিছুই জানে না।

পানির মিস্ত্রি এই কথায় অপমানিত বোধ করে কি বলেছিল, রানার ভাই তাকে চুপ শুওরের বাচ্চা বলে ধাঁতানি দিয়েছেন।

মিস্ত্রীর শরীর বন্য মহিষের মতো। ঘাড় গর্দানে এক হয়ে আছে। তাকে শুওরের বাচ্চা বলতে হলে যথেষ্ট সাহস লাগে। সাদেক আলির সাহস সীমাহীন। মাঝখানে ঘাবড়ে গেছে রানা।

মিস্ত্রি থমথমে গলায় বলল, আপনে যে আমারে শুওরের বাচ্চা কইলেন।

সাদেক আলি বললেন, চুপ। আবার মুখে মুখে কথা। রানা দে তো এই হারামজাদার গালে একটা চড়। আমাকে কোশ্চেন করে। সাহস কত।

এমন পরিস্থিতিতে বাড়ি ছেড়ে চায়ের দোকানে আসা সম্ভব না। রানা একবার সাদেক আলির দিকে একবার পানির মিস্ত্রির দিকে তাকাচ্ছে।

সাদেক আলি আরেকবার হুংকার দিলেন, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, চড় দে।

রানা সত্যি-সত্যি চড় বসিয়ে দিল।

'প্রজেক্ট দারুচিনি দ্বীপের' ব্লু প্রিন্ট তৈরী প্রায় শেষ।

দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে, মোতালেব টাকা পয়সার ব্যাপারগুলো দেখবে তাকে অর্থ মন্ত্রী বলা চলে। জেনারেল ফান্ড থাকবে তার কাছে। জেনারেল ফান্ড থেকে টাকা-পয়সা সেই খরচ করবে। খাওয়া-দাওয়া, নাশ্‌তা এইসব বিষয়ে কারো আলাদা কিছু করতে হবে না। সবাই একই ধরনের খাবার খাবে। একই নাশ্‌তা।

কল্যাণ মন্ত্রীর পোর্ট ফলিও সর্বসম্মতিক্রমে রানাকে তার অনুপস্থিতিতেই দেয়া হয়েছে। দলের সুখ-সুবিধা সে দেখবে। হোটেল খুঁজে বের করা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় কিভাবে যাওয়া হবে এই সব ব্যবস্থা তার। ট্রেনের টিকিটও সেই কাটবে। সেন্ট মার্টিনে কিভাবে যেতে হবে তাও সেই খুঁজে বের করবে।

মোতালেব বলল, এন্টারটেইনমেন্টটা আমার হাতে ছেড়ে দে। গান-বাজনা দিয়ে হুলুস্থুল করে দেব।

তারেক বিরক্ত গলায় বলল, তুই গান জানিস না-কি?

'ক্যাসেট প্লেয়ার নিচ্ছি। রবীন্দ্র সংগীতের ছ'টা ক্যাসেট নিচ্ছি।'

তারেক আরো বিরক্ত হয়ে বলল, যাচ্ছি এক ধরনের এক্সপিডিসনে—সেখানে

রবীন্দ্র সংগীত? কুঁ কুঁ করে—"সখী গো—ধর ধর।"

'টেগোরকে নিয়ে এই রকম ইনসালটিং কথা বললে কিন্তু ফাটাফাটি হয়ে যাবে। নাক বরাবর ফ্রী ষ্টাইল ঘুঁসি খাবি।'

মোতালেব ক্রমাগত সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে গিয়ে সে সিগারেট ছেড়ে দেবে—কাজেই যতটা পারা যায় খেয়ে নেয়া। সে দশ মিনিটের মাথায় তৃতীয় সিগারেটটা ধরাতে ধরাতে বলল, এতবড় একটা আন্দোলনের মাথায় আমাদের কি যাওয়া উচিত? আরেকবার ভেবে দেখ সবাই।

তারেক খুবই বিরক্ত হলো। রাগী গলায় বলল, আন্দোলন নিয়ে তুই বড় বড় বাত ছাড়বি না। গোটা আন্দোলনের সময় তুই ঘরে বসে ফিডার দিয়ে দুধ খেয়েছিস। আন্দোলন করেছি আমরা। পুলিশের বাড়ি খেয়ে মাথা ফাটিয়েছি। চার খান ষ্টীচ লেগেছে। এরশাদকে 'গেট আউট; করেছি—এখন খানিকটা আমোদ-ফূর্তি করা যায়।

'আন্দোলন তো এখনো শেষ হয় নি।'

'ফিরে এসে করব। উইথ নিউ এনার্জি। এরশাদকে জেলখানায় নেয়ার জন্যে লাঠি মিছিল হবে। আমরা সবাই থাকব একেবারে ফ্রন্টে।'

সঞ্জু উঁচু গলায় বলল, চুপ করতো—ইম্পর্টেন্ট কাজ বাকি আছে। দুটা ডিসিসান নিতে হবে। এক নাম্বার—শুভ্র না-কি আমাদের সঙ্গে যেতে চাচ্ছে—ওকে নেয়া যাবে না।

মোতালেব বলল, মাথা খারাপ ওকে কি জন্যে নেব? আম্বাকে নিয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে। পিসু করতেও তার কমোড লাগে।

সঞ্জু বলল, গোড়াতেই ওকে না করার দরকার ছিল। তখন তো কেউ কিছু বললি না।

'তখন ভেবেছিলাম নিজ থেকেই পিছিয়ে পড়বে। এইসব পুতু পুতু জাপানি ডল শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায় শেষ পর্যন্ত যায় না।'

মোতালেব বলল, ওরটা আমার উপর ছেড়ে দে। আমি সামলাব।

সঞ্জু বলল, তুই কি ভাবে সামলাবি?

'আমাদের আলটিমেট পরিকল্পনার কথা বললেই সে চোখ বড় বড় করে বলবে—আমি যাব না।'

মোতালেবের আলটিমেট পরিকল্পনা অবশ্যি এখনো দলের অনুমোদন পায় নি। তবে সরাসরি কেউ এখন পর্যন্ত 'না' বলে নি। মেয়েরা যদি শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যায় তাহলে এই পরিকল্পনার প্রশ্নই উঠে না। মেয়েরা সম্ভবত যাবে না। মেয়েরা সব ব্যাপারে শুরুতে খুব উৎসাহ দেখায়, তারপর যেই বাড়ি থেকে একটা ধমক

খায় ওম্নি সব ঠাণ্ডা।

মোতালেবের পরিকল্পনা হলো। জোছনা রাতে—ঠিক বারটা এক মিনিটে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করার জন্যে সভ্যতার সমস্ত সংশ্রব বিসর্জন দিতে হবে; অর্থাৎ জামা-কাপড় সব খুলে আদি মানব হতে হবে। তারপর সমুদ্রের জলে নেমে যাওয়া। প্রকৃতির পরিপূর্ণ অংশ হয়ে যাওয়া। মাঝে-মাঝে জল থেকে উঠে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে ছুটে যাওয়া হবে। বালিতে গড়াগড়ি করা হবে। আবার পানিতে নেমে যাওয়া। এ রকম চলবে সারা রাত। ঠিক সূর্য উঠার পর পর সভ্য জগতে ফিরে আসা হবে। জামাকাপড় গায়ে দেয়া হবে।

মোতালেবের পরিকল্পনাটা যেমন বর্ণনার ভঙ্গি তারচে অনেক বেশি সুন্দর। সে হাত-পা নেড়ে গলার স্বর উঠা-নামা করে পুরো ব্যাপারটা এমন ভাবে বলল যে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বলতে পারল না, শুধু রানা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমরা নেংটো হয়ে দৌড়াদৌড়ি করব তখন যদি স্থানীয় লোকজন পিটিয়ে দেয়।

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, স্থানীয় লোক? স্থানীয় লোক কোথায় পেলি সেন্ট মার্টিন হলো একটা প্রবাল দ্বীপ। জনমানব নেই। ধু ধু করছে বালি, নারিকেল গাছ, পাম গাছের সারি। আধো অন্ধকার আধো আলো।

'ঠাণ্ডা লাগবে না, শীতের সময়?'

'ঠাণ্ডাতো লাগবেই। আদিম মানবের ঠাণ্ডা লাগে নি? তাছাড়া স্যুয়েটার গায়ে দিয়ে পানিতে নামলে কি তোর ঠাণ্ডা কম লাগবে? যাই হোক আমি আমার পরিকল্পনার কথা বললাম, তোরা যদি রাজি নাও হোস আমি একাই এগিয়ে যাব। যাকে বলে—একলা চল একলা চল রে।'

রানা এবং বল্টু দুই জন প্রায় এক সঙ্গেই চায়ের দোকানে ঢুকল। রানার ভাবভঙ্গি বলে দিচ্ছে সে ভয়াবহ দুর্যোগ অতিক্রম করে এসেছে। এখনো নিজেকে পুরোপুরি সামলে উঠতে পারে নি। বল্টুকেও কেমন যেন বিপর্যস্ত লাগছে। বল্টু ছোটখাট মানুষ, কোন সমস্যা হলেই সে আরো ছোট হয়ে যায় বলে মনে হয়।

সে সঞ্জুর পাশে বসতে বসতে বলল, অবস্থা কেরোসিন। আনুশকা আমার বাসায় এসেছিল, বলেছে সব মিলিয়ে পাঁচ জন মেয়ে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

মোতালেব বলল, মাথা খারাপ না-কি। মেয়েদের আমরা সাথে নিচ্ছি না। নট এ সিংগেল ওয়ান।

বল্টু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, সেই কথা এখন বলে লাভ কি? তোরা আগে কোথায় ছিলি? তখন গদগদ গলায় কেন বললি—তোমরা মেয়েরা যদি যেতে

চাও, যেতে পার। নো প্রবলেম।

'আমি কোনদিন এই কথা বলি নি। মেয়েদের না নেয়ার পেছনে আমার একশ একটা যুক্তি আছে।'

'সেই একশ একটা যুক্তি তুই আনুশকাকে বুঝিয়ে বল।'

'আমি তার বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝিয়ে আসব? আমার এত দায় পড়ে নি।'

'বাসায় গিয়ে যুক্তি বুঝাতে হবে না। আনুশকা এখানে আসছে। আমি ঠিকানা দিয়ে দিয়েছি—দশ মিনিটের মধ্যে চলে আসবে। তার আসার আগে আগে একটা কথা আমি পরিষ্কার বলতে চাই—মেয়েদের সঙ্গে নেয়ার আমি ডেড এগেইনস্টে। যদি তাদেরকে নিতে চাও, নাও আমার নামটা কেটে বাদ দিয়ে দাও। আমার স্ট্রেইট কথা।'

সঞ্জু বলল, তোর এত আপত্তি কেন? যেতে চাচ্ছে যাক না। দল যত বড় হয় ততই তো ভালো।

বল্টু কঠিন গলায় বলল, পাঁচটা মেয়ে সঙ্গে গেলে আমাদের ভেড়া বানিয়ে রাখবে। সারাক্ষণ ফরমাস, এটা কর, ওটা কর। জংলা জায়গায় যাচ্ছি—কোথায় বাথরুম কোথায় কি। তারপর সুন্দর সুন্দর মেয়ে—ধর গুণ্ডা বা ডাকাত এ্যাটাক করে একটাকে ধরে নিয়ে গেল—তখন অবস্থা কি হবে? কিংবা ধর সমুদ্রে নেমেছে হঠাৎ ঢেউ এসে একটাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। চোরাবালিতে আটকে গেল এক জন। তখন তোরা কি করবি আমাকে বল।

কেউ কোন কথা বলল না।

রানা আরেক দফা চায়ের কথা বলে এসে ক্ষীণ স্বরে বলল, আমারো মনে হয় মেয়েদের নেয়া ঠিক হবে না। তবু যদি নিতেই হয় তাহলে একটা লিখিত আন্ডারটেকিং দিয়ে নিতে হবে। লেখা থাকবে আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

মোতালেব কড়া গলায় বলল, চুপ কর গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস। ভদ্রসমাজে কথা বলার কোন যোগ্যতা তোর নেই। আমাদের ডিসিসান মেকিং এর সময় তুই দয়া করে একটা কথা বলবি না। নট এ সিংগেল ওয়ার্ড।

আনুশকাদের কালো বিশাল গাড়ি চায়ের দোকানের সামনে এসে থেমেছে। আনুশকা যখন সন্ধ্যার পর চলাফেরা করে তখন ড্রাইভার ছাড়াও ড্রাইভারের পাশে এক জন থাকে। তার নাম মফিজ। আনুশকার দিকে নজর রাখাই যার একমাত্র কাজ। আনুশকা হাসিমুখে গাড়ি থেকে নামল। চায়ের দোকানের সবাই ঘুরে তাকাল। অনেকক্ষণ কারো চোখে পলক পড়ল না। পলক না পড়ারই কথা। আনুশকার মতো রূপবতী সচরাচর চোখে পড়ে না।

চায়ের দোকানের মালিক উঠে দাঁড়িয়েছে—এমন কাস্টমার তার দোকানে আসে না। ইনি নিশ্চয়ই কাস্টমার না, অন্য কোন ব্যাপার। আনুশকা দোকানের মালিকের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি গলায় বলল, চিনি এবং দুধ ছাড়া এক কাপ চা দিতে পারেন? বলেই অপেক্ষা করল না—এগিয়ে গেল দলটির দিকে।

রানা অস্বস্তির সঙ্গে বলল, এখানে রাতের বেলা আসার কি দরকার ছিল?

আনুশকা বসতে বসতে বলল, কোনই দরকার ছিল না, তবু আসলাম। যাবার ব্যাপারটা চূড়ান্ত করতে চাই। সব মিলিয়ে আমরা পাঁচ জন মেয়ে যাচ্ছি। তাদের প্রতিনিধি হিসেবে আমি এসেছি।

বল্টু অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, আমরা তোমাদের নিচ্ছি না।

'আমিও তাই আন্দাজ করছিলাম। কেন জানতে পারি?'

'অনেক ঝামেলা।'

'কি কি ঝামেলা তা কি বলা যাবে?'

'একশ একটা ঝামেলা। তার মধ্যে একটা বললেই তোমরা পিছিয়ে যাবে।'

'বল শুনি।'

'সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে কোন বাথরুম নেই।'

'বাথরুম নেই?'

'না।'

'যদি না থাকে তোমরা একটা বাথরুম বানিয়ে দেবে।'

মোতালেব ক্রুদ্ধ গলায় বলল, সেন্টমার্টিন আইল্যান্ডে আমরা বাথরুম বানানোর জন্যে যাচ্ছি?

'কি জন্যে যাচ্ছ শুনি?'

'সেটা এখন তোমাকে এক্সপ্লেইন করতে পারব না। আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে। মেয়েছেলে থাকলে সেখানে সমস্যা।'

'মেয়েছেলে-পুরুষছেলের মধ্যে তফাতটা কি শুনি? পুরুষ হয়েছ বলে তোমাদের কি একটা লেজ গজিয়েছে?'

'তর্কাতর্কির কোন ব্যাপার না—আসল কথা এবং ফাইন্যাল কথা তোমাদের আমরা নিচ্ছি না। আমরা স্বাধীন ভাবে ঘুরব।'

'আমরা সঙ্গে থাকলে পরাধীন হয়ে যাবে? এইসব শিখেছ কোত্থেকে?'

'রানা বলল, তর্ক করার জন্যে তর্ক করলে তো লাভ হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ব্যাপারটা দেখ—এটা যদি পিকনিক হত, ধর জয়দেবপুরে যাচ্ছি—সকালে যাব সন্ধ্যায় ফিরে আসব, তাহলে একটা কথা ছিল। ব্যাপারটা মোটেই পিকনিক না। এক সপ্তাহের জন্যে যাচ্ছি।

চা দিয়ে গেছে। চিনি-দুধ ছাড়া গাঢ় কাল রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। যা দেখলেই গায়ে কাঁটা দেয়ার কথা। আনুশকা নির্বিকার ভঙ্গিতে তাতে চুমুক দিচ্ছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে চা খেয়ে সে বেশ তৃপ্তি পাচ্ছে।

মোতালেব বলল, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা কর আনুশকা, তুমি সাতদিনের জন্যে আমাদের সঙ্গে যেতে চাও। অচেনা অজানা জায়গায় রাতে বিরাতে ঘুরবে। অথচ এই ঢাকা শহরেও তুমি সন্ধ্যার পর একা চলাফেরা করতে পার না। তোমার সঙ্গে একটা বিশাল গাড়ি থাকে। গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়াও এক জন বডিগার্ড থাকে। থাকে না?

আনুশ্কা চায়ের কাপ নামিয়ে উঠে দাঁড়াল এবং শীতল গলায় বলল, গাড়ি বিদায় করে আবার আসছি। তোমাদের সঙ্গে রাত বারটা পর্যন্ত গল্প করব। তারপর একা একা বাসায় ফিরব।

দলের সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সবাই দেখল আনুশ্কা ড্রাইভারকে কি বলতেই হুস করে গাড়ি বেরিয়ে গেছে। আনুশ্কা শান্ত মুখে ফিরে আসছে। যেন কিছুই হয় নি।

'সে বসতে বসতে বলল, তোমরা কবে যাচ্ছ শুনি?'

'মঙ্গলবার।'

'এই মঙ্গলবার?'

'হুঁ।'

'রাতের ট্রেনে যাব। চিটাগাং পৌছব ভোরবেলা। সকালে নাশতা খেয়ে বাসে করে যাব কক্সবাজার। এক রাত সেখানে থেকে পরদিন ভোরে রওনা হব টেকনাফ। অর্থাৎ টেকনাফ পৌছাচ্ছি বৃহস্পতিবার দুপুরে। সেখানে কোনো একটা হোটেলে লাঞ্চ করে নৌকা নিয়ে যাব সেন্টমার্টিন। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পৌছব। সন্ধ্যার পর আকাশে উঠবে পূর্ণ চন্দ্র।'

আনুশ্কা বলল, শেষবারের মত জিজ্ঞেস করছি। তোমরা আমাদের নিচ্ছ কি নিচ্ছ না?

সঞ্জু বলল, নিচ্ছি না।

'ভেরি গুড। আমরা নিজেরা নিজেরা যাব। একই সময়ে রওনা হব। একই ট্রেনে যাব। টেকনাফও একই ভাবে পৌছব। এখন কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছ?'

'এই পাগলামীর কোনো মানে হয়?'

'মানে না হলে কিছু করার নেই। আমার সিদ্ধান্ত আমি জানিয়ে গেলাম। এখন বাসায় যাচ্ছি। আমার বাসায় সবাই বসে আছে। ওদের খবর দিতে হবে।'

রানা বলল, গাড়িতো ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছ, চল তোমাকে বাসায় দিয়ে আসি।

আনুশকা রাগী গলায় বলল, কাউকে বাসায় পৌঁছে দিতে হবে না। I can take care of myself.

'কি মুশকিল তুমি একা যাবে না-কি?'

'অফকোর্স আমি একা একা যাব। আমাকে তোমরা ভেবেছ কি?'

'রিকশা বা বেবীটেক্সীতে তুলে দেই?'

'না তাও তুলতে হবে না। আমি একা যাব।'

সবাইকে মোটামুটি হতচকিত করে আনুশ্‌কা বেরিয়ে গেল। যাবার আগে ম্যানেজারকে চায়ের দাম দিয়ে গেল। ম্যানেজার কিছুতেই দাম নেবে না। আনুশ্‌কা বলল, আবার যখন আসব, আপনার গেস্ট হিসেবে তিন কাপ চা খাব। আজকের দামটা রাখুন। আজতো আমি আপনার গেস্ট না। আজ প্রথম পরিচয় হলো। ভাই আপনার নাম কি?

ম্যানেজার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলল, মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া।

'মোহাম্মদ ইসমাইল মিয়া, যাই। খোদা হাফেজ।'

আনুশ্‌কাকে রিক্সা বা বেবীটেক্সির জন্যে বেশিদূর হাঁটতে হলো না। কারণ সে গাড়ি বিদেয় করে নি। ড্রাইভারকে বলেছে গাড়ি শ্যামলী সিনেমা হলের কাছে নিয়ে রাখতে। ড্রাইভার তাই রেখেছে।

৪

ধানমণ্ডি তের নম্বরে আনুশ্‌কাদের বাড়ি।

বাড়িটা একতলা, অনেক উঁচু কম্পাউন্ড। বাইরে থেকে দেখে মনে হয় ছোট্ট একটা বাড়ি। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলে হকচকিয়ে যেতে হয়। দেড় বিঘা জায়গার উপর চমৎকার বাড়ি। বাড়ির চেয়েও সুন্দর, চারপাশের বাগান। দুই জন মালী এই বাগানের পেছনে সারাক্ষণ কাজ করে। আনুশকার বাবা মনসুর আলি এদের কাজে পুরোপুরি খুশি নন। তিনি আরেক জন মালি খুঁজছেন যে গোলাপ বিশেষজ্ঞ। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এখনো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই চমৎকার বাড়ি বৎসরের বেশির ভাগ সময় খালি পড়ে থাকে; কারণ বাড়ির মূল বাসিন্দা মাত্র দুই জন আনুশ্‌কা এবং তার বাবা। আনুশ্‌কার মা দশ বছর আগে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে অন্য এক জনকে বিয়ে করেছেন। এখন স্থায়ীভাবে বাস করছেন অস্ট্রেলিয়ায়। একটিমাত্র মেয়ের প্রতি তাঁর তেমন কোন আকর্ষণ আছে বলে মনে হয় না। চিঠি-পত্র বা টেলিফোনে যোগাযোগ নেই বললেই হয়।

আনুশ্‌কার বাবা মনসুর আলি মানুষটি ছোটখাট। তাঁর মুখ দেখলেই মনে

হয়, জগৎ-সংসারের উপর অত্যন্ত বিরক্ত আছেন। যদিও মানুষটি সদালাপী, অত্যন্ত ভদ্র। তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই কাটে সমুদ্রের উপর। পেশায় তিনি এক জন নাবিক। বর্তমানে চেক জাহাজ "এনরিও কর্ণির" তিনি প্রধান চালক। তিনি যখন জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে থাকেন তখন আনুশকা বাড়িতে থাকে না। আত্মীয় স্বজনদের বাড়িতে থাকে। বাড়িটা দুই জন মালি, দুই জন দারোয়ান, তিনটি কাজের মেয়ে এবং এক জন ড্রাইভারের হাতে থাকে। এরা ছাড়াও বাড়ি পাহারা দেয় একটি জার্মান শেফার্ড কুকুর। কুকুরটির বয়স এগারো; অর্থাৎ সে তার আয়ু শেষ করে এসেছে। আর হয়ত বৎসর খানেক বাঁচবে। আজকাল জোছনা রাতে সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে করুণ সুরে ডাকে। কুকুরটার নাম মেঘবতী। মেঘের মতো গায়ের রঙ হওয়ায় পুরুষ কুকুর হয়েও স্ত্রী জাতীয় নাম তাকে নিতে হয়েছে। নামকরণ করেছে আনুশ্‌কা। আনুশ্‌কার সঙ্গে মেঘবতীর তেমন ভাব নেই। মনসুর আলি সাহেবকে দেখলে মেঘবতীর আনন্দ এবং উল্লাসের সীমা থাকে না। সে যেন তখন তার যৌবন ফিরে পায়। একবার সে আনন্দে অভিভূত হয়ে মনসুর আলি সাহেবের জুতা কামড়ে ফালা ফালা করে ফেলেছিল।

আজও তাই হচ্ছে।

কোনো খবর না দিয়ে মনসুর আলি সাহেব উপস্থিত হয়েছেন। এয়ারপোর্ট থেকে বিকল্প টেক্সি নিয়ে চলে আসা। দারোয়ান গেট খুলে ভূত দেখার মত চমকে উঠল। তিনি বললেন—সব ভালো? দারোয়ান কিছু বলার আগেই মেঘবতী ছুটে এল। যে গতিতে সে ছুটে এল তা এগার বছরের কুকুরের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। মেঘবতী তার কুকুর-হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা একসঙ্গে প্রকাশের জন্যে ব্যস্ত। মানুষের মতো তার কোনো ভাষা নেই। সুমধুর সংগীত নেই।

মনসুর আলি সাহেব হাত বুলিয়ে মেঘবতীকে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সে শান্ত হচ্ছে না। আরো অস্থির হয়ে পড়েছে।

হৈ চৈ শুনে বারান্দায় চারটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তারা ভীত চোখে গেটের দিকে তাকিয়ে আছে। এরা আনুশ্‌কার চার বান্ধবী—নইমা, নীরা, ইলোরা এবং জরী। তারা এসেছে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে কথা বলতে। আজ রাতটা তারা এ বাড়িতে থাকবে। হৈ চৈ করবে।

মনসুর আলি মেয়েদের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, ইদ্রিস এরা কারা?

ইদ্রিস বলল, 'আপার বান্ধবী।'

'আনুশ্‌কা কি বাসায় নেই?'

'জ্বে না, গাড়ি লইয়া গেছেন, সাথে মফিজ দারোয়ান আছে।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা।'

মনসুর আলি এগিয়ে গেলেন। মেয়ে চারটি আরো জড়সড় হয়ে গেল।

মনসুর আলি বললেন, মা'রা তোমরা কেমন আছ?

কেউ কোন জবাব দিল না।

তিনি হাসি মুখে বললেন, আমি আনুশ্‌কার বাবা। হঠাৎ চলে এসেছি। আজ বুঝি তোমাদের পার্টি?

নইমা বলল, স্লামালিকুম চাচা।

'ওয়ালাইকুম সালাম মা। এসো ভেতরে যাই। বাইরে ঠাণ্ডা। তোমাদের একা রেখে আনুশ্‌কা কোথায় গেল?'

'ও এক্ষুণি এসে পড়বে।'

তারা বসার ঘরে একসঙ্গে ঢুকল। মনসুর আলি বললেন, মা'রা তোমরা একটু বস। তোমাদের এক নজর ভালো করে দেখি। কি নাম তোমাদের মা?

তারা নাম বলল।

সবার শেষে নাম বলল জরী। বলেই মনসুর আলিকে বিস্মিত করে দিয়ে কাছে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

তিনি অবাক হয়ে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তাকিয়েই মনে হলো—মেয়েটা বড় সুন্দর। তরুণী শরীরে বালিকার একটি স্নিগ্ধ মুখ। যে মুখের দিকে তাকালে মনে এক ধরনের বিষাদ বোধ হয়।

জরী সালাম করায় অন্য মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হলো। মনসুর আলি বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, মাঝে মাঝে আমি কোনো খবরাখবর না দিয়ে হঠাৎ চলে আসি। এবার এসেছি দশদিনের জন্যে। এডেন বন্দরে আমার জাহাজের একটা টারবাইন নষ্ট হয়ে গেল। ওটা সারাতে কুড়ি দিনের মতো লাগবে। ভাবলাম ওরা টারবাইন সারাতে থাকুক, এই ফাঁকে আনুশ্‌কাকে দেখে আসি। আনুশ্‌কা ছাড়া, দেশে আসার আমার আরো একটা জরুরী কারণ ছিল—এরশাদ গভমেন্ট ফল করানোর চেষ্টা চলছে সেই খবর পাচ্ছিলাম, ভাবলাম নিজের চোখে দেখে আসি কি হয়। এই বয়সে আন্দোলনে তো আর অংশ নিতে পারব না অন্তত উপস্থিত থাকি। আমরা যারা বাইরে থাকি তারা দেশের জন্যে খুব ছটফট করি। আচ্ছা মা, তোমরা গল্প টল্প কর। তোমরা কি ডিনার করে ফেলেছ?

'জ্বি-না।'

'বেশ তাহলে ডিনারের সময় গল্প করব। আমি খানিকটা বিশ্রাম করি।

শরীরটা ভালো লাগছে না। যারা জাহাজ চালায় তারা আকাশ যাত্রা খুব অপছন্দ করে। আকাশে উঠলেই তাদের শরীর খারাপ করে।'

মনসুর আলি বিশ্রামের কথা বলে উঠলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেবার কোন লক্ষণ তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। তিনি বাগানে চলে গেলেন। মালী এসে বাইরের সবগুলো বাতি জ্বেলে দিল। বাইরে থেকে ফিরেই তিনি প্রথম যা দেখেন তা বাগান। বাগান দেখা হলে নিজের ঘরে ঢুকে পর পর তিন পেগ মার্টিনি খান। তারপর প্রায় ঘন্টাখানিক বাথটাবে শুয়ে স্নান করেন।

তিনি বাগানে হাঁটছেন।

ঘরের কাজের মানুষগুলো অতি ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। পানির টাবে গরম পানি ভর্তি করা হচ্ছে। মার্টিনি তৈরি করা হচ্ছে। ঘরের বিছানায় নতুন চাদর বিছানো হচ্ছে। ধবধবে শাদা চাদর ছাড়া তিনি ঘুমুতে পারেন না। শুধু বিছানার চাদর নয়, দরজা জানালার চাঁদর সবই হতে হয় শাদা। এতে না-কি জাহাজ জাহাজ ভাব হয়। অন্য সময় তাঁর ঘরের পর্দা থাকে রঙ্গিন। তিনি এলেই সব পাল্টানো হয়।

মনসুর আলি বাগানে হাঁটছেন। তার পেছন পেছনে আসছে মেঘবতী। মালি দুই জন সঙ্গে সঙ্গে আছে। তারা খানিকটা শংকিত। মনসুর আলি কখনো কারো সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলেন না। তবু সবাই তাঁর ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

তিনি বাগান থেকেই লক্ষ্য করলেন আনুশ্‌কার গাড়ি ঢুকছে। দারোয়ান খুব আগ্রহ নিয়ে তাকে কি সব বলছে। অবশ্যই তাঁর আসার খবর। তিনি মালি দুইজনের দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বললেন, তোমরা এখন যাও।

আনুশ্‌কা তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে বাগানে আসবে।

তিনি চান না কন্যার সঙ্গে দেখা হবার সময়টায় মালি দুই জন থাকে। তিনি হাতের চুরুট ফেলে মেয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

আনুশ্‌কা গেটের কাছেই গাড়ি থেকে নেমেছে। সে হালকা চালে কয়েক পা এগুল, তারপর কি যেন হলো, ঠিক যে গতিতে মেঘবতী ছুটে এসেছিল সেই গতিতে ছুটে এল। মেঘবতী যেমন করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেও তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনুশ্‌কা এখন আর একুশ বছর বয়েসী তরুণী নয়। সে যেন ছ'বছরের বালিকা। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে এবং কোটের একটি অংশ চোখের জলে ভিজিয়ে ফেলেছে।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে যে কথাগুলো বলছে তা হলো, বাবা তুমি খুব খারাপ। বাবা, তুমি খুব খারাপ।

মনসুর আলি মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে নীচু গলায় বলছেন, শান্ত হও মা, শান্ত হও।

শান্ত হবার কোনো রকম লক্ষণ আনুশ্‌কার মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, মা তোমার বন্ধুরা অপেক্ষা করছে। তুমি ওদের কোম্পানী দাও। আমার খাবার ব্যবস্থা কি করছে একটু দেখ। শুটকি মাছ খেতে ইচ্ছা করছে। ঘরে কি শুটকি মাছ আছে?

আনুশ্‌কা চোখের জল মুছে হাসি মুখে বলল, অবশ্যই আছে। আমি সব সময় রাখি। তুমি হুট করে একদিন চলে আস। এসেই বিশ্রী জিনিসটা খেতে চাও।

'মনটা শান্ত হয়েছে মা?'

'হয়েছে।'

'যাও বন্ধুদের কাছে যাও। তোমরা ডিনার করে নিও—আমার খেতে অনেক দেরী হবে।'

মনসুর আলি আরেকটা চুরুট ধরালেন। আনুশ্‌কা বলল, তুমি না গতবার আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে গেলে সিগারেট ছেড়ে দেবে?

'সিগারেট তো মা ছেড়েই দিয়েছি। সিগারেট ছেড়ে আমি এখন চুরুট ধরেছি।'

'ভালো করেছ। ক'দিন থাকবে?'

'দশ দিন।'

'আমি কিন্তু মঙ্গলবার এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি।'

'আমিও কি যাচ্ছি?'

'না তুমি যাচ্ছ না। আমরা কিছু বন্ধু মিলে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড যাচ্ছি। জোছনা রাতে প্রবাল দ্বীপে ঘুরব।'

'বাহ্ ভালো তো। তোমার যে সব বন্ধুদের দেখলাম ওরা সবাই যাচ্ছে?'

'জরী ছাড়া সবাই যাচ্ছে।'

'ও যাচ্ছে না কেন?'

'ওকে তার বাবা মা যেতে দেবেন না। তাদের ফ্যামিলী খুব কনজারভেটিভ। কি রকম যে কনজারভেটিভ চিন্তাই করতে পারবে না। তাছাড়া কয়েকদিন আগে তার এনগেজমেন্ট হয়েছে। তার স্বামীর দিকের লোকজনও যখন জানবে যে সে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে সেন্ট মার্টিন গেছে ওম্নি বিয়ে 'নট' হয়ে যাবে। আমরা অবশ্যি খুব চাপাচাপি করছি।'

'এই রকম অবস্থায় চাপাচাপি না করাই তো ভালো মা।'

আনুশ্‌কা রাগী গলায় বলল, 'না করা ভালো কেন? সোসাইটি চেঞ্জ করতে

হবে না। মেয়ে হয়েছি বলে কি আমরা ছোট হয়ে গেছি? আমরা কি চিনামাটির পুতুল যে আমাদের সাজিয়ে গুজিয়ে শো কেসে তালাবদ্ধ করে রাখতে হবে। আমরা নিজের ইচ্ছায় কোন কিছু করতে পারব না। কোথাও যেতে পারব না। সব সময় একটা আতংক নিয়ে থাকতে হবে।'

'তুমিতো মা বিরাট বক্তৃতা দিয়ে ফেলছ।'

'মাঝে মাঝে রাগে আমার গা জ্বলে যায় বাবা। সত্যি রাগে গা জ্বলে যায়।'

মনসুর আলি হাসলেন। আনুশ্কা থমথমে গলায় বলল, সব পুরুষের উপর আমার প্রচণ্ড রাগ বাবা। তোমার উপরও রাগ। তুমি পুরুষ না হয়ে মেয়ে হলে খুব ভালো হত। বাবা আমি ভেতরে যাচ্ছি। দেখি জরীকে রাজি করানো যায় কি না।

জরীকে কিছুতেই কায়দা করা গেল না। যে যাই বলে সে হেসে বলে— পাগল, আমি একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে এতদূর গেলে বটি দিয়ে কুপিয়ে আমাকে চাক চাক করবে।

নীরা বলল, করুক না। আগেই ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছিস কেন? আমার ফ্যামিলী কি কম কনজারভেটিভ? কলেজে যখন পড়তাম মা এসে কলেজে দিয়ে যেতেন, কলেজ থেকে নিয়ে যেতেন। একদিন আগে আগে কলেজ ছুটি হয়ে গেল। রিকশা করে বাসায় চলে এসেছি—মা'র কি রাগ। চিৎকার করছে—তোর এত সাহস? তোর এত সাহস?

জরী বলল, খালা এখন তোকে যেতে দিচ্ছেন?

'অফকোর্স দিচ্ছেন। আমি বলেছি— ইউনিভার্সিটি থেকে যাচ্ছি। দুই জন স্যার আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। এক জন পুরুষ স্যার, এক জন মহিলা স্যার।'

'মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিস? যদি জানতে পারেন।'

'জানতে পারলে জানবে। আই ডোন্ট কেয়ার। আমি কাউকেই কেয়ার করি না— আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা।'

ক্লাসে নীরার নাম হচ্ছে— সুনীলের প্রেমিকা। নীরা নামের মেয়েকে নিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচুর কবিতা ও গল্প আছে। নামকরণের এই হচ্ছে উৎস। নীরা যখন নতুন মেয়ের সঙ্গে পরিচয় করে— তখন ফিস ফিস করে বলে, ভাই আমার নাম নীরা, আমি হচ্ছি সুনীলের প্রেমিকা। আমাকে চিনেছতো? নতুন মেয়েটি সাধারণত হকচকিয়ে বলে, চিনতে পারছি নাতো। তখন নীরা গলার স্বর আরো নামিয়ে বলে, সেকি, আমাকে নিয়ে সুনীল যে সব কবিতা লিখেছে তার একটাও তুমি পড়নি? ঐ যে ঐ কবিতাটা—

'এ হাত ছুঁয়েছে নীরার হাত। আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি।'

এই কবিতাটাতো আমার এই রোগা কাল হাত নিয়ে লেখা। তখন নখগুলোত বড় বড় ছিল। সুনীল আমার হাত ধরতেই নখের খোঁচায় তার হাত কেটে রক্ত বের হয়ে গেল। কি লজ্জা বলতো।

আনুশ্‌কা বলল, আয় খেতে খেতে গল্প করি। টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে। বাবা এখন খাবেন না। কাজেই খেতে খেতে ফ্রীলি কথা বলতে পারবি।

নইমা বলল, অশ্লীল রসিকতা করা যাবে? একটা সাংঘাতিক অশ্লীল রসিকতা শুনেছি তোদের না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। এমন জঘন্য রসিকতা এর আগে শুনি নি। জঘন্য কিন্তু এমন মজার— হাসতে হাসতে তোরা গড়াগড়ি খাবি।

জরী করুণ মুখে বলল, তোর এই সব রসিকতা শুনতে আমার খুব খারাপ লাগে।

নইমা বলল, খারাপ লাগার কি আছে? ছ'দিন পর তোর বিয়ে হচ্ছে—শুধু অশ্লীল রসিকতা? আরো কত কি শুনবি হাসবেন্ডের কাছে। আগে থেকে একটু ট্রেনিং থাকা ভালো না?

'প্লীজ না, প্লীজ।'

ইলোরা বলল, তুই কানে তুলো দিয়ে রাখ জরী। আমি শুনব। আমার শুনতে ইচ্ছা করছে।

নইমা বলল, গল্পটা হলো হরিদ্বারের এক সাধুকে নিয়ে। সাধু চিরকুমার এবং দিগম্বর সাধু। রাস্তায় রাস্তায় উদোম ঘুরে বেড়ায়...

এই পর্যন্ত বলতেই ইলোরা মুখে আঁচল দিয়ে হাসতে লাগল। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সবার মুখে...গল্পটা সত্যি মজার। জরীও হেসে ফেলল। সচরাচর এই জাতীয় গল্পে সে হাসে না।

নইমা বলল, খেতে খেতে আরো দুটি গল্প শুনাব। সেই দুটি আরো মারাত্মক। আনুশ্‌কা, খাবার টেবিলে বয়-বাবুর্চি কেউ আসবে নাতো। এই সব গল্প ক্লোজ সার্কেলের বাইরে কেউ শুনলে প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে।

জরী খেতে বসল না।

সে বেশ জোরের সঙ্গেই বলল, তোমরা খাও, আমি চাচার সঙ্গে খাব। উনি একা খাবেন।

আনুশ্‌কা বলল, বাবা একা একা খেতেই বেশি পছন্দ করে। তুই খা'তো আমাদের সঙ্গে। বাবার খেতে অনেক দেরী আছে।

'দেরী হলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার মোটেও ক্ষিধে পায় নি।'

মূল কবিতায় আছে এ হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ। আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি? নীরা নিজের সুবিধার জন্যে কবিতার লাইনটি একটু পাল্টে নিয়েছে।

ইলোরা বলল, তুই এত ঢং করছিস কেন? উনার মেয়ে উনার সঙ্গে বসছে না আর তুই কিনা...মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি। ঢং করিস নাতো।

'ঢং করছি না। আমার এখন খেতে ইচ্ছা করছে না।'

নইমা বলল, ও আমাদের সঙ্গে খেতে বসছে না তার মূল কারণ কি জানিস? আমাদের সঙ্গে বসলেই গল্প শুনতে হবে—এই তার ভয়। এ রকম ভিক্টোরিয়ান মানসিকতা তুই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরীতে কি করে পেলি বলতো? তোর হ্যাজবেন্ড যখন হাত বাড়িয়ে—

জরী আতংকে নীল হয়ে বলল, তোর পায়ে পড়ি নইমা আর বলিস না।

'সত্যি সত্যি পায়ে ধর—নয়তো সেনটেন্স শেষ করব।'

জরী উঠে এসে নইমার দুই হাত ধরল। করুণ গলায় বলল, লজ্জা দিস না নইমা, প্লীজ।

নইমা বলল, আচ্ছা যা মাফ করে দিলাম।

নীরা বলল, আনুশকা আমার ডানদিকে একটা খালি চেয়ার রাখতে হবে। আমি সব সময় তাই করি। সুনীল সেই চেয়ারে বসে। ওর একটা হাত থাকে আমার কোলে।

নইমা বলল, সেই হাত নিষ্ক্রিয় না সক্রিয়?

সবাই খিল খিল করে হেসে উঠল।

মনসুর আলি খেতে বসে খুব অবাক হলেন।

জরী মেয়েটি তার সামনে প্লেট নিয়ে বসে আছে।

তিনি বললেন, মা তুমি খাও নি?

'জ্বি না চাচা। আমি আপনার সঙ্গে খাব।'

'আমার সঙ্গে খাবে?'

জরী নীচু গলায় বলল, কেউ একা একা খাচ্ছে এটা দেখলে আমার খুব খারাপ লাগে চাচা।

'আমি কিন্তু মা, সব সময় একাই খাই। জাহাজে জাহাজে থাকি তো, কেবিনে খাবার দিয়ে যায়।'

'সমুদ্র কি আপনার ভালো লাগে চাচা?'

'যখন সমুদ্রে থাকি তখন ভালো লাগে না কিন্তু সমুদ্র ছেড়ে ডাঙ্গায় আসলেই খুব অস্থির লাগে। সমুদ্রের এক ধরনের নিজস্ব ভাষা আছে। সেই ভাষায় সে ডাকে। সেই ভাষা বোঝার জন্যে একদিন দুই দিন সমুদ্রে থাকলে হয় না। বৎসরের পর বৎসর থাকতে হয়।'

জরী হালকা গলায় বলল, চাচা আমি এখনো সমুদ্র দেখিনি। খুব দেখতে ইচ্ছা করে।

'ইচ্ছা করাই তো স্বাভাবিক।'

'আমি মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে সমুদ্র স্বপ্নে দেখি।'

'ওদের সঙ্গে গেলে দেখতে পারতে। স্বপ্নের সমুদ্রের চেয়ে বাস্তবের সমুদ্র অনেক বেশি সুন্দর। স্বপ্ন এবং কল্পনা এই একটি জিনিসকে কখনো অতিক্রম করতে পারবে না। মা তুমি ওদের সঙ্গে যাও।'

'আমার পক্ষে সম্ভব হবে না চাচা। বাবা-মা কিছুতেই রাজি হবে না।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা। বাবা-মা'র মত না থাকলে যাওয়া উচিত হবে না। সবচে ভালো হয় কি জান মা? সবচে ভালো হয় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে যদি প্রথম সমুদ্র দেখ।'

জরী কিছু বলল না।

তিনি বললেন, আনুশ্‌কা বলছিল তোমার নাকি এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে?

জরী অস্পষ্ট স্বরে বলল, জ্বি।

'তাহলে বিয়ের পর ঐ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যাও। তোমাদের খুব ভালো লাগবে। আমি বরং এক কাজ করব। ওয়াটার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে একটা চিঠি লিখে যাব। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ঐ চিঠি তার কাছে নিয়ে গেলেই তোমাদের দুই জনের জন্যে সমুদ্রগামী জাহাজে ঘুরবার ব্যবস্থা করে দেবে। আমি দেশ ছেড়ে যাবার আগে আনুশ্‌কার কাছে চিঠি দিয়ে যাব।'

'থ্যাংক ইউ চাচা।'

'মাই ডিয়ার চাইল্ড, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। মা শোন, ডিনারের সঙ্গে আমি একটু রেড ওয়াইন খাই, কুড়ি বছরের অভ্যেস। তুমি সামনে বসে আছ বলে অস্বস্তি বোধ করছি।'

'অস্বস্তি বোধ করার কিছু নেই চাচা। আপনি খান।'

'এখন বল যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হলো সে কি করে?

'ব্যবসা করে।'

'কিসের ব্যবসা?'

'কিসের ব্যবসা তা ঠিক জানি না। তবে তাদের অনেক টাকা পয়সা।'

'অনেক টাকা পয়সা কথাটা তুমি এমনভাবে বললে যাতে মনে হয় অনেক টাকা পয়সা তোমার পছন্দ না।'

জরী চুপ করে রইল।

এখন সে আর ভাত মুখে দিচ্ছে না। শুধু মাখাচ্ছে।

তিনি কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললেন, মা ছেলেটিকে কি তোমার পছন্দ হয় নি?

জরী বেশ স্পষ্ট স্বরে বলল, না।

মনসুর আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন। জরী আগের চেয়েও স্পষ্ট স্বরে বলল, তাকে আমার এতটুকুও পছন্দ হয় নি। বলে সে নিজেই বিস্মিত হলো। সে তার মনের এই কথাগুলো কাউকেই বলে নি। তার মা-বাবাকে বলেনি। বান্ধবীদের বলে নি। তার ডায়েরী যেখানে অনেক গোপন কথা লেখা হয় সেখানেও এই প্রসঙ্গে একটি কথা লেখে নি। অথচ নিতান্ত অপরিচিত এক জন মানুষকে কত সহজেই না সে বলল। এই পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ আছে যাদের কখনো অপরিচিত মনে হয় না।

মনসুর আলি বললেন, একটা মানুষকে এক ঝলক দেখে বা একদিন দুই দিন দেখে তার সম্পর্কে ধারণা তৈরি করা ঠিক না। প্রায়ই দেখা যায় শুরুতে একটা মানুষকে খারাপ লাগে, কিছুদিন পর আর লাগে না। অসম্ভব ভালো লাগতে শুরু করে। এই আমাকেই দেখনা কেন—আমাকে দেখে একটা কঠিন, আবেগহীন, রসকষবিবর্জিত মানুষ মনে হবে। আমি যে তা না সেটা বুঝতে হলে আমার সঙ্গে মিশতে হবে।

জরী বলল, চাচা আপনাকে প্রথম দেখেই বুঝতে পেরেছি আপনি কেমন মানুষ। আমি এইসব খুব ভালো বুঝতে পারি।

'অপছন্দের কথাটা তাহলে তুমি তোমার বাবা-মা'কে বল।'

'উনাদের বলা সম্ভব না।'

'কেন সম্ভব না, জানতে পারি?'

'আমরা বড় চাচার সঙ্গে থাকি। আমার বাবা কিছুই করেন না। উনি বড় চাচার আশ্রিত বলতে পারেন। এই বিয়ে বড় চাচা ঠিক করেছেন, তাঁর বন্ধুর ছেলে। আমার না বলার কোনো উপায় নেই।'

'তোমার নিজের পছন্দের কোনো ছেলে কি আছে?'

'জ্বি না।'

'কি ধরনের ছেলে তোমার পছন্দ বলতো শুনি। সব মেয়ের মনে স্বামী সম্পর্কে এক ধরনের ধারণা থাকে। তোমার ধারণাটা জানতে ইচ্ছা করছে।'

'ঐসব নিয়ে আমি কখনো ভাবিনি চাচা।'

মনসুর আলি সাহেবের মনটাই খারাপ হয়ে গেল। এই মেয়েটা তাঁর সঙ্গে খেতে না বসলেই ভালো হত। মেয়েটা তাঁর মন অসম্ভব খারাপ করে দিয়েছে। মন খারাপ হলেই রক্তে শরীরের ডাক প্রবল হয়ে উঠে। ভালো লাগে না। সমুদ্রের

কাছ থেকে তিনি এখন মুক্তি চান। মুক্তি।

আনুশ্‌কাদের ঘরে এখন তুমুল ঝগড়া চলছে। ঝগড়া করছে নইমা এবং ইলোরা। ঝগড়ার কারণ হচ্ছে ইলোরা নইমাকে ওয়েল ট্যাংকার বলেছে। নইমাকে ওয়েল ট্যাংকার আজ প্রথম বলা হলো না। আগেও ফিস ফিস করে তাকে এই নামে ডাকা হয়েছে। তার শরীরের বিশালত্বের সঙ্গে নামটার একটা যোগসূত্র আছে বলেই নইমা এই নাম সহ্য করতে পারে না।

নইমা এবং ইলোরার বাক্যযুদ্ধ বেশ কিছুক্ষণ ধরেই চলছে। আনুশ্‌কা একটু দূরে হাসি মুখে বসে আছে। নীরা, আনুশ্‌কার পাশে। তারা দুই জনে ফিস ফিস করছে এবং চাপা হাসি হাসছে। নীরা বলল, আনুশ্‌কা আজকের বাক্যযুদ্ধে কে জিতবে?

আনুশ্‌কা বলল, ইলোরা। ওর সঙ্গে কথায় পারা মুশকিল।

'উঁহু। জিতবে নইমা। নইমা অশ্লীল ইংগিত করে ইলোরাকে রাগিয়ে দেবে। রাগলে ইলোরার লজিক কাজ করে না। উল্টাপাল্টা কথা বলে। তুই নিজেই দেখ আস্তে আস্তে কেমন রাগাচ্ছে।'

'তুই কি আমার সঙ্গে একশ টাকা বাজি রাখবি?'

'আচ্ছা বেশ একশ টাকা বাজি।'

বাজি রেখে দুই জন আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে।

ইলোরা ঠাণ্ডা কথার প্যাঁচে নইমাকে ঘায়েল করার চেষ্টা করছে। নইমা কথা বলছে উঁচু গলায়। আনুশ্‌কা ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়েছে যাতে আওয়াজ বাইরে না যায়। আর কেউ যেন কিছু শুনতে না পায়।

ইলোরা বলছে, ওয়েল ট্যাংকার বলায় এত রাগিস কেন? ওয়েল ট্যাংকার বললেতো তোকে অনেক কম বলা হয়। ফুলে ফেঁপে তুই যা হয়েছিস তোকে হিপোপোটমাস ডাকা উচিত। তোর ঘাড় গর্দান সব এক হয়ে গেছে।'

'আমার ঘাড় গর্দান সব এক হয়ে গেছে?'

'হুঁ। তুই যখন রাস্তা দিয়ে যাস তখন আশেপাশের লোকজন তোকে দেখে খুব আনন্দ পায়। এই রকম দৃশ্য তো সচরাচর দেখা যায় না।'

'এই রকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না?'

'না। যতই দিন যাচ্ছে দৃশ্য ততই মজাদার হচ্ছে। আচ্ছা ডেইলি তোর ওজন কত করে বাড়ে? এক কেজি না দুই কেজি?'

'তোর নিজের ধারণা তুই রাজকুমারী?'

'আমাকে নিয়ে তো কথা হচ্ছে না। তোকে নিয়ে কথা হচ্ছে। তুই ওয়েল

ট্যাংকার কি-না তাই নিয়ে বিতর্ক।'

নইমা আর পারল না। হঠাৎ কেঁদে ফেলল। ছেলেমানুষের মতো হাউমাউ করে কান্না।

আনুশ্‌কা, নীরাকে বলল—দে টাকা দে। তুই বাজিতে হেরেছিস।

নীরা, ব্যাগ খুলে টাকা বের করল। ওদের অতি প্রিয় এক জন বান্ধবী যে শিশুদের মতো কাঁদছে ঐ দিকে তাদের কোনো নজর নেই।

জীবনের এই অংশটা বড়ই মধুর। আনুশ্‌কা উঠে গিয়ে ইংরেজি গান দিয়ে দিয়েছে। সুর ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে—

Don't make my brown eyes blue.

নইমা চাপা স্বরে বলল, গান বন্ধ কর।

আনুশ্‌কা বলল, গান বন্ধ করব কেন? তুই কাঁদছিস বলে আমাদেরও কাঁদতে হবে নাকি?

ইলোরা এবং নীরা এক সঙ্গে হেসে উঠল, সেই হাসিতে নইমাও যোগ দিল।

নীরা বলল, তুই চট করে কেঁদে আমার একশ টাকা লস করিয়ে দিলি। তুই জিতবি, এই নিয়ে একশ টাকা বাজি ছিল। তুই যত মোটা হচ্ছিস তোর বুদ্ধিও ততো মোটা হচ্ছে।

আবার সবাই হেসে উঠল।

নীরা বলল, রবীন্দ্র সংগীত দে ভাই, ইংরেজি ভালো লাগছে না।

ইলোরা বলল, ফর গডস সেক, রবীন্দ্র সংগীত না। সখী ভালোবাসি ভালোবাসি এই সব গান আমার অসহ্য।

অসহ্য হলেও উপায় নেই। আনুশ্‌কা রাজেশ্বরী দত্তের রেকর্ড খুঁজতে শুরু করেছে।

আনুশ্‌কা বলল, শুরুর বাজনাটা শুনে কেউ যদি বলতে পারিস এটা কোন গান তাহলে তাকে আমি পাঁচশ টাকা দেব। মন দিয়ে শোন—রেকর্ড বাজতে শুরু করেছে। সবাই চুপ করে আছে। সেতারের হালকা কাজ। কোন গান বোঝা যাচ্ছে না।

গান হচ্ছে। রাজশ্বেরী দত্তের কিন্নর কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। চারটি তরুণী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে।

যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিবে যায় বারে বারে
আমার জীবনে তোমার আসন গভীর অন্ধকারে।।

৫

আজ মঙ্গলবার

ভোর সাতটা।

চায়ের টেবিলে শুভ্র এবং ইয়াজউদ্দিন সাহেব বসে আছেন। রেহানা নেই। তিনি রান্নাঘরে। ভাপা পিঠা বানানো হচ্ছে। তার তদারকি হচ্ছে। পিঠাগুলো কেন জানি কিছুতেই জোড়া লাগছে না। ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, আজইতো তোমাদের যাত্রা?

শুভ্র মাথা নাড়ল।

'সব ঠিক ঠাক আছে তো?'

'আছে।'

'রাতের ট্রেনে যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'টিকেট কাটা হয়েছে?'

'না। স্টেশনে গিয়ে কাটা হবে।'

'এডভান্স কাটা হলো না কেন?'

'সবাই যাবে কিনা এখনো ফাইন্যাল হয়নি। যাদের যাবার কথা তার চেয়ে কয়েকজন বেশিও হতে পারে। আবার যাদের যাবার কথা তাদের মাঝখানে থেকে কেউ কেউ বাদ পড়তে পারে।'

'অনেক আগে থেকেইতো প্রোগ্রাম করা। বাদ পড়বে কেন?'

'বল্টু বলছিল—সে যাবে কি যাবে না তা মঙ্গলবার রাত আটটার আগে বলতে পারবে না।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব থমথমে গলায় বললেন, বল্টু? বল্টু মানে?

'সয়েল সায়েন্সে পড়ে একটা ছেলে, আমার বন্ধু।'

'বল্টু নামের ছেলে তোমার বন্ধু?'

'ওর ভালো নাম অয়ন। লম্বায় খাটো বলে সবাই ওকে বল্টু ডাকে।'

'সবাই বল্টু ডাকে বলে তুমিও ডাকবে? তুমি নিজেওতো অসম্ভব রোগা। তোমাকে যদি কেউ যক্ষা রোগী ডাকে তোমার ভালো লাগবে?'

'প্রথম কিছুদিন খারাপ লাগবে। তারপর অভ্যাস হয়ে যাবে। তখন মনে হবে এটাই আমার নাম। তাছাড়া বল্টুর মতো আমারো নাম আছে।'

তিনি হতভম্ব হয়ে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, তোমারও নাম আছে?

'হ্যাঁ। বাংলা নববর্ষে সবাইকে খেতাব দেয়া হয়। আমাকেও দিয়েছে। এটা এক ধরনের ফান। এতে আপসেট হবার কিছু নেই।'

'তোমাকে কি নামে ডাকে?'

'বাদ দাও বাবা, শুনলে তোমার হয়ত খারাপ লাগবে।'

'খারাপ লাগলেও আমি শুনতে চাই।'

'বন্ধু বান্ধবরা আমাকে ডাকে কানা-বাবা। চোখে কম দেখিতো, এই জন্যে।'

ইয়াজউদ্দিন শীতল গলায় বললেন, তোমাকে কানা-বাবা ডাকে?'

'জ্বি।'

'যারা তোমাকে কানা-বাবা ডাকে তাদের সঙ্গেই তুমি যাচ্ছ?'

শুভ্র চুপ করে রইল। সামান্য নাম নিয়ে বাবা এত রাগছেন কেন সে বুঝতে পারছে না। কত কুৎসিত কুৎসিত নাম আছে। এই সব নামের তুলনায় কানা-বাবা তো খুব ভদ্র নাম। মজার নাম।

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, কানা-বাবা নাম তোমাকে নববর্ষে খেতাব হিসেবে দেয়া হলো?

'না। এই নামটা এম্নিতেই চালু হয়ে গেছে।'

'মনে হচ্ছে নাম চালু হয়ে যাওয়ায় তুমি খুব খুশি।'

'নামে কিছু যায় আসে না বাবা। আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ে আছে বেশ মোটা সোটা। এই জন্যে তার নাম ওয়েল ট্যাংকার। আরেকটি খুব রোগা মেয়ে আছে, তার নাম সূতা ক্রিমি।'

'কি বললে সূতা ক্রিমি?'

'জ্বি।'

'এই নামে তাকে ডাকা হয়?'

'হ্যাঁ হয়।'

'সেও কি সূতা ক্রিমি ডাকায় তোমার মতোই খুশি?'

'না সে খুব রাগ করে। কান্নাকাটি করে। এই জন্যে তাকে পুরো নাম ধরে ডাকা হয় না, ছোট করে ডাকা হয়।'

'কি ডাকা হয় জানতে পারি?'

'তাকে আমরা ডাকি "সূ-ক্রি"।

'আমরা ডাকি মানে তুমি নিজেও ডাক?'

'না আমি কখনো ডাকি না। ওর আসল নামটা খুব সুন্দর। আমি ঐ নামেই ডাকি।'

'এর আসল নামটা কি?'

'নীলাঞ্জনা।'

ইয়াজউদ্দিন সিগারেট হাতে বসে রইলেন। যে মেয়ের নাম নীলাঞ্জনা তাকে ক্লাসের ছেলেরা ডাকছে সূতা ক্রিমি। কোনো মানে হয়?

'শুভ্র।'

'জ্বি।'

'নামকরণের বিষয় নিয়ে আমি আর কিছু বলতে চাচ্ছি না। শুনতেও চাচ্ছি না। তোমাকে কিছু উপদেশ দেবার জন্যে বসে আছি। উপদেশগুলো দেবার আগে একটা জিনিস জানতে চাই, যে সব বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ, তারা কি তোমাকে খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে?'

'না। খুব আগ্রহ করে নিচ্ছে না। বরং ওরা চাচ্ছে আমি যেন না যাই।'

'এ রকম চাচ্ছে কেন?'

'ওদের ধারণা আমি চোখে দেখতেই পাই না। আমাকে নিয়ে ওরা বিপদে পড়বে। মোতালেব বলে আমার এক বন্ধু আছে, সে বলছে, শুভ্র তুই না গেলে ভালো হয়। তুই যদি যাস তাহলে তোকে কোলে নিয়ে নিয়ে আমাদের ঘুরতে হবে।'

'মোতালেব কি তোমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু?'

'হ্যাঁ। আমি তাই মনে করি। ওরা অবশ্যি তা করে না।'

'মোতালেব তোমাকে তুই তুই করে বলে?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিও কি তাই বল?'

'না। আমি তুই বলতে পারি না।'

'আমার প্রথম উপদেশ হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিশতে হলে ওদের মতো হয়ে মিশতে হবে। তুমিও তুই বলবে।'

'দ্বিতীয় উপদেশ কি?'

'দ্বিতীয় উপদেশ হচ্ছে দলের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করা। সবাই তো পারে না। কেউ কেউ পারে। তারা হচ্ছে ন্যাচারাল লিডার। তুমি তা নও। তোমার তেমন বুদ্ধি নেই, অন্যদের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা নেই। কিন্তু এসব ছাড়াও লিডারশীপ নেয়া যায়।'

'কি ভাবে?'

'টাকা দিয়ে।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কি ওদের সবাইকে টাকা দিয়ে বলব—এই নাও টাকা। এখন থেকে আমি তোমাদের লিডার। আমি যা বলব তাই শুনতে হবে।'

'ব্যাপারটা মোটামুটি তাই। তবে করতে হয় আরো সূক্ষ্মভাবে। যেমন ধর, তোমরা সবাই যখন ষ্টেশনে উপস্থিত হলে—টিকিট কাটা নিয়ে কথা হচ্ছে। থার্ড ক্লাসে যাওয়া হবে না সেকেন্ড ক্লাসে যাওয়া হবে এই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন তুমি বলবে—তোরা যদি কিছুমনে না করিস আমি একটা প্রথম শ্রেণীর পুরো

কামরা রিজার্ভ করে রেখেছি। টিকিট কাটতে হবে না। আয় আমার সঙ্গে। সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠবে। খুব সূক্ষ্ম একটা প্রভাব তুমি ওদের উপর ফেলবে।'

শুভ্র অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে রইল।

রেহানা পিঠা নিয়ে এসেছেন। তাঁকে খানিকটা লজ্জিত মনে হচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও পিঠাগুলো জোড়া লাগানো সম্ভব হয় নি।

ইয়াজউদ্দিন বললেন, এই বস্তুগুলো কি?

'ভাপা পিঠা।'

'দয়া করে এগুলো সামনে থেকে নিয়ে যাও।'

রেহানা পিঠার থালা উঠিয়ে চলে গেলেন। ইয়াজউদ্দিন বললেন, ট্রেনে খাবার দাবারে তুমি কিন্তু একটা পয়সাও খরচ করবে না। সামান্য এক কাপ চা যদি খাও খুব চেষ্টা করবে যেন অন্য কেউ দাম দিয়ে দেয়।'

'আমি পুরো একটা প্রথম শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করতে পারি আর সামান্য চায়ের পয়সা দিতে পারি না?'

'না পার না। যেই মুহূর্তে তুমি সব খরচ দিতে শুরু করবে সেই মুহূর্তেই বন্ধুদের কাছে তুমি দুগ্ধবতী বোকা গাভী হিসেবে পরিগনিত হবে। যাকে সব সময় দোহন করা যায়। এতে দলের উপর কোনো প্রভাব তো পড়বেই না বরং তুমি সবার হাসির খোরাক হবে। সবাই তোমাকে নিয়ে হাসবে।'

শুভ্র এক দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। সে এক ধরনের বিস্ময় অনুভব করছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, চিটাগাং থেকে কক্সবাজার তুমি ওদের ব্যবস্থামতোই যাবে, কিন্তু কক্সবাজার থেকে টেকনাফ যাবার পথে আবার মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করবে। ঝকঝকে মাইক্রোবাস।

'কি ভাবে করব?'

'তোমাকে কিছুই করতে হবে না। ব্যবস্থা করা থাকবে। এতে যা হবে তা হচ্ছে সবাই জানবে তুমি ইচ্ছা করলেই চমৎকার ব্যবস্থা করতে পার, কিন্তু সেই ইচ্ছা তোমার সব সময় হয় না। তোমার উপর এক ধরনের ভরসা তারা করতে শুরু করবে। তোমার প্রত্যক্ষ প্রভাব সবার উপর পড়তে শুরু করবে।'

'টেকনাফ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডে যাবার জন্য ইঞ্জিনচালিত নৌকা পাওয়া যায়। ঐ সব নৌকা করেই তুমি যাবে, তবে নৌকা যদি ছোট হয় এবং সমুদ্রে যদি ঢেউ বেশি থাকে তাহলে টেকনাফের বিডিআর ক্যাম্পে যাবে। ওদের একটা ট্রলার আছে। যে ট্রলারের সাহায্যে ওরা সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ডের বিডিআর আউট পোস্টের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ওদের খবর দেয়া আছে। তুমি চাওয়া মাত্র ওরা তোমাকে সাহায্য করবে।'

শুভ্র বলল, বাবা আমি এসব কিছুই করতে চাই না।

'চাও না?

'জ্বি না।'

'ভালো কথা। না চাইলে করতে হবে না। তবে রাতে ট্রেনের কামরা রিজার্ভ থাকবে এবং কক্সবাজারে হোটেল সায়মনের সামনে মাইক্রোবাস থাকবে। তুমি যদি মত বদলাও তাহলে এই সুবিধা নিতে পার।'

'আমি মত বদলাব না। আমি যেমন আছি তেমন থাকতে চাই বাবা। আমি কারোর উপর কোনো প্রভাব ফেলতে চাই না।'

'তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হস্তক্ষেপ করব না—তবে ব্যবস্থা সবই থাকবে।'

টেলিফোনে রিং হচ্ছে। ইয়াজউদ্দিন সাহেব উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলেন। হ্যালো বলতেই ও পাশ থেকে শোনা গেল,

'কে কানা-বাবা? তোর কাছে একস্ট্রা হ্যান্ড ব্যাগ আছে। আমাকে দিতে পারবি।'

ইয়াজউদ্দিন সাহেব শীতল গলায় বললেন, তুমি ধরে থাক। আমি কানা-বাবাকে দিচ্ছি।

টেলিফোন করেছিল বল্টু। সে খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

৬

সঞ্জুর জিনিসপত্র গোছ গাছ করা হচ্ছে।

গোছানোর কাজটা করছেন ফরিদা। সঞ্জু বলল, তুমি কষ্ট করছ কেন মা? দাও আমাকে দাও।

ফরিদা ধমক দিলেন, তুই চুপ করে বসতো। চা খাবি? ও মুনা যা ভাইয়ার জন্যে চা বানিয়ে আন। আমাকেও একটু দিস। আর তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করে আয় সে খাবে না-কি।

সঞ্জু বলল, বাবা অফিসে যান নি?

'না।'

'জ্বরতো কমেছে। জ্বর কমেনি?'

'হ্যাঁ কমেছে। তুই আজ চলে যাচ্ছিস—তাই অফিসে গেল না।'

'সে কি?'

সঞ্জুর সত্যি সত্যি লজ্জা করতে লাগল। বাবা অফিসে না গিয়ে ঘরে বসে থাকার সঙ্গে তার বেড়াতে যাবার সম্পর্কটা সে ঠিক ধরতে পারছে না।

ফরিদা বললেন, যা তুই তোর বাবার সঙ্গে কথা বলে আয়।

'আমি কি কথা বলব? বাবাকে দেখলেই আমার হার্ট বিট শ্লো হয়ে যায়।'

'কি যে তুই বলিস। উনি কি জীবনে তোদের বকা দিয়েছেন না-কি উঁচু গলায় একটা কথা বলেছেন?'

'তবু বাবাকে সাংঘাতিক ভয় লাগে মা। তুমি ঐ বদ-রঙ্গা শালটা দিচ্ছ কেন?'

'তোর বাবা বলেছে সঙ্গে নিয়ে যেতে। নিয়ে যা। না নিলে উনি মনে কষ্ট পাবেন। আর শোন বাবা, যা উনার কাছে গিয়ে বস, একটু গল্প টল্প কর।'

'কি গল্প করব বলতো?'

'গল্প না করলে না করবি। সামনে গিয়ে বস।'

'সঞ্জু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উঠে গেল।

সোবাহান সাহেব খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

সঞ্জুকে ঢুকতে দেখেও খবরের কাগজ থেকে মুখ তুললেন না। মৃদু স্বরে বললেন, বস।

সঞ্জু বসল।

এমনভাবে বসল যেন বাবার মুখোমুখি হতে না হয়। সোবাহান সাহেব বললেন, সাদ্দামকে তোর কেমন মনে হয়?

প্রশ্নটি এতই অপ্রত্যাশিত যে সঞ্জু পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। সোবাহান সাহেব বললেন, স্কাড জিনিসটাতো দেখি খুবই মারাত্মক।

কিছু না বললে ভালো দেখায় না বলেই সঞ্জু বলল, খুব মারাত্মক না। পেট্রিয়ট দিয়েতো শেষ করে দিচ্ছে।

'আরে না। এই সব ওয়েস্টার্ন প্রেসের কথা বার্তা। একটাও বিশ্বাস করবি না। সাদ্দাম সহজ পাত্র না। বুশের কাল ঘাম বের করে দিয়েছে। এই ঝামেলা হবে আগে জানলে সে মিডলইস্টের ত্রিসীমানায় আসত না।'

মিডল ইস্টের আলোচনায় যাবার কোনো রকম ইচ্ছা সঞ্জু অনুভব করছে না। অথচ সে বুঝতে পারছে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করা খুবই উচিত। বাবা তাই চাচ্ছেন। কেমন বন্ধুর মতো গলায় কথা বলছেন। যিনি তাঁর ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কখনো কথা বলেন না তিনি যদি হঠাৎ বন্ধুর মতো আচরণ করতে থাকেন তাহলে বিরাট সমস্যা হয়।

মুনা চা নিয়ে আসায় পরিস্থিতির খানিকটা উন্নতি হলো। কিছু একটা করার সুযোগ পাওয়া গেছে। চা খাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকা যাবে।

চায়ে চিনি হয় নি। বিস্বাদ তিতকুট খানিকটা তরল পদার্থ, যার উপর খুব কম হলেও চারটা পিপড়া ভাসছে। মুনা যতই দিন যাচ্ছে ততই গাধা হচ্ছে। বাবা

সামনে না থাকলে ধমক দিয়ে দেয়া যেত। এখন ধমক দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হাসি হাসি মুখ করে চা খেয়ে যেতে হবে। মুড়ি ভিজিয়ে লোকজন যেমন চা খায় তেমনি পিপড়া ভিজিয়ে চা খাওয়া। সঞ্জু এক চুমুকে সব ক'টা পিপড়া খেয়ে ফেলল।

সোবাহান সাহেব বললেন, তোমার মতো বয়সে আমি একবার ঘুরতে বের হয়েছিলাম। দার্জিলিং গিয়েছিলাম। বেনাপোল হয়ে কলকাতায়। সেখান থেকে বাসে করে শিলিগুড়ি।

সঞ্জু চুপ করে রইল। সোবাহান সাহেব কোলের উপর বালিস টেনে নিয়েছেন। এটা তাঁর দীর্ঘ আলাপের প্রস্তুতি কি-না তা সঞ্জু বুঝতে পারল না। বাবার সব কথা বার্তাই সংক্ষিপ্ত আজ কি তাঁকে কথা বলার ভূতে পেয়েছে? এত কথা বলছেন কেন?

'শিলিগুড়িতে একটা ধর্মশালায় এক রাত ছিলাম। ভাড়া কত জানিস? এক টাকা। ঐ ধর্মশালাতে থাকাই আমার কাল হলো। সকালে উঠে দেখি টাকা পয়সা সব চুরি হয়ে গেছে। পায়জামা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে কম্বলের নিচে শুয়েছিলাম। পায়জামা পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছুই নেই। হা-হা-হা।'

তিনি যেভাবে হাসছেন তাতে মনে হচ্ছে ঐ সময়কার খারাপ অবস্থাটাও খুব মজার ছিল। যদিও মজার হবার কোনোই কারণ নেই। বিদেশে টাকা পয়সা চুরি হয়ে যাওয়া তো ভয়াবহ।

'তারপর কি হলো শোন—আমার বিছানার পাশের বিছানায় ঘুমুচ্ছিলেন এক সাধুবাবা। তিনি বললেন, ক্যা হুয়া লেড়কা? আমি বললাম, সব চুরি গেছে।'

'বাংলায় বললেন?'

'না বাংলায় বললে কি বুঝবে? আমি ভাঙ্গা চোরা হিন্দীতে বললাম এক চোরানে সব লে কর ভাগ গিয়া।'

গল্পের এই পর্যায়ে মুনা ঘরে ঢুকে বলল, ভাইয়া বল্টু ভাই এসেছে। সঞ্জু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এখন বাবার সামনে থেকে উঠে যাবার একটা অজুহাত পাওয়া গেল। সে বলল, বাবা আমি একটু আসছি।

বল্টু চুল কাটিয়েছে।

গায়ে মেরুন রঙের হাফ হাওয়াই সার্ট। সার্ট নতুন কেনা হয়েছে। স্যুয়েটারে একটা ফুটো আছে বলে স্যুয়েটার পরেছে সার্টের নিচে। সঞ্জুকে দেখেই বলল, বিরাট কেলেংকারীয়াস ব্যাপার হয়েছে। শুভ্রকে টেলিফোন করেছিলাম, ধরেছেন

শুভ্রর বাবা। উনার গলা অবিকল শুভ্রর মতোন। আমি বললাম, কে কানা বাবা নাকি? তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে? কি অবস্থা দেখতো।

'উনি কি বললেন?'

'কি বললেন ভালো করে শুনতেই পারি নি। ভয়ে তখন আমার ব্রেইন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সঞ্জু তোর কাছে এক্সট্রা হ্যান্ডব্যাগ আছে?'

'না।'

'আমি একটা জোগাড় করেছি সেটার আবার চেইন লাগে না।'

'তুইতো আর হীরা-মুক্তা নিয়ে যাচ্ছিস না। চেইন না লাগলেও কিছু না।'

'তা ঠিক।'

'তোর যাওয়া কি হবে? তুই যে বলছিলি রাত আটটার আগে বলতে পারবি না।'

'রাত আটটার সময় টাকা পাওয়ার কথা। যদি পাই তবেই যাওয়া হবে। না পেলে না। আমি প্রাইভেট টিউশ্যানী করি না? আমার ছাত্রকে বলে রেখেছি। মানে ধার হিসেবে চেয়েছি। সে বলেছে জোগাড় করে রাখবে। তোর টাকা জোগাড় হয়েছে?'

'মার কাছ থেকে নিচ্ছি।'

'তুই সুখে আছিস। টাকা চাওয়ার লোক আছে। আমার অবস্থাটা দেখ ছাত্রের কাছে টাকা ধার চাইছি।'

সঞ্জু বলল, চা খাবি?

'না। ব্যাগের সন্ধানে বের হব। সব রেডি রাখি যদি টাকা পাওয়া যায়। তুই মুনাকে একটু ডাকতো। মুনা বলছিল নিউ মার্কেট যাবে। আমি ঝিকাতলা যাব, নিউ মার্কেটে ওকে নামিয়ে দেব।'

মুনার কথা বলতে গিয়ে বল্টুর বুক ধ্বক ধ্বক করছিল। সব সময় মনে হচ্ছিল সঞ্জু আবার কিছু বুঝে ফেলছে নাতো? সে অবশ্যি প্রাণপণ চেষ্টা করছে স্বাভাবিক থাকার। কিন্তু মনের ভাব কতদিন আর গোপন থাকবে? মুনার কথা মনে হলে শরীরে কেমন যেন এক ধরনের কাঁপুনি হয়। কথা বলতে গেলে কথা বেঁধে যায়। কি যে সমস্যা হয়েছে। সঞ্জু তাঁর প্রাণের বন্ধু। সে যদি তার মনের ভাব কোনোদিন জেনে ফেলে খুবই লজ্জার ব্যাপার হবে। অবশ্যি সঞ্জু এখনো কিছুই বুঝতে পারে নি। সে যে এই বাড়িতে একটু সেজে গুজে আসে তাও লক্ষ্য করে নি।

তবে মুনার ব্যাপারটা সে এখনো কিছু বুঝতে পারছে না। বাচ্চা মেয়ে মাত্র সেকেন্ড ইয়ারে উঠেছে অথচ কথাবার্তার মার প্যাঁচ অসাধারণ। প্রতিটি কথার

দুইটা তিনটা মানে হয়। কোন মানেটা রাখবে, কোনটা রাখবে না সেটাই সমস্যা।

রিকশায় উঠেই বল্টু রিকশাওয়ালাকে বলল, হুড তুলে দাওতো।

মুনা বলল হুড তুলতে হবে কেন?

'কে কি মনে করে।'

মুনা বলল, মনে করা করির কি আছে? ভাই-বোন রিকশা করে যাচ্ছি।

বল্টুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। ভাই বোন মানে? এসব কি বলছে মুনা। বল্টু মুখের মন খারাপ ভাব আড়াল করার জন্যে সিগারেট ধরাল। মুনা বলল, বল্টু ভাই, আজ আপনাকে আরো বাঁটু বলে মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি বলুনতো? আপনি কি কোমরে টাইট করে বেল্ট পরেছেন?

'তোমাকে কতবার বলেছি আমাকে বল্টু ভাই ডাকবে না। আমার ক্লাসের বন্ধুরা ডাকে সেটা ভিন্ন কথা। তুমি ডাকবে কেন?'

'মনের ভুলে ডেকে ফেলি। আর ভুল হবে না এখন থেকে অয়ন ভাই ডাকব। আচ্ছা অয়ন মানে কি?'

'ঐ ইয়ে পর্বত।'

'আপনার মতো বাঁটু লোকের নাম পর্বত? আশ্চর্য তো।'

অয়নের মন আরো খারাপ হয়ে গেল। মুনা বলল, আপনি সত্যি জানেন অয়ন মানে পর্বত?'

'জানব না কেন? নিজের নামের মানে জানব না?'

'উঁহু আপনি জানেন না। আমি চলন্তিকায় দেখেছি অয়ন হচ্ছে পথ। সূর্যের গতি পথ। অয়নাংশ মানে সূর্যের গতিপথের অংশ।'

অয়নের মনটা ভালো হয়ে গেল। এই মেয়ের মনে তার প্রতি সিরিয়াস ধরনের ফিলিংস আছে। ফিলিংস না থাকলে চলন্তিকা থেকে নামের মানে বের করত না। অবশ্যিই ফিলিংস আছে। অবশ্যই।

'অয়ন ভাই।'

'কি?'

'আপনার নাম নয়ন হলে ভালো হত। আপনার চোখ সুন্দর।'

'কি যে তুমি বল।'

'তবে আলাদা আলাদা করে দেখলে সুন্দর। দুইটা চোখ একত্রে দেখলে মনে হয় একটা একটু ট্যারা। আপনি লক্ষ্য করেছেন?'

অয়ন কিছু বলল না। পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে গেল মুনার তার প্রতি কোন রকম আকর্ষণ নেই। ফাজলামী করে বেড়াচ্ছে। এর বেশি কিছু না। মাঝে মাঝে

আচমকা যে সব আবেগের কথা বলে তাও নিশ্চয়ই এক ধরনের রসিকতা। অল্পবয়েসী মেয়েরা ক্রুর রসিকতা পছন্দ করে। বিশেষ করে সেই মেয়ে যদি অসাধারণ রূপবতী হয় তাহলেতো কথাই নেই।

'মুনা, নিউ মার্কেট এসে গেছে তুমি এখানে নাম, আমি এই রিকশা নিয়েই চলে যাব।'

'আমি একা একা নিউ মার্কেটে ঘুরব? আপনি একটু আসুন না।'

অয়ন নেমে পড়ল। মেয়েটা তাকে পছন্দ করে না তাতে কি। সেতো করে। আরো খানিকটা সময়তো পাওয়া যাচ্ছে মুনার সঙ্গে থাকার। এটাই বা কম কি। অয়ন গম্ভীর গলায় বলল, যা কেনার চট করে কেন, আমার কাজ আছে।

'আমার পাঁচ মিনিট লাগবে।'

'পাঁচ মিনিটেই শেষ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই আমার হাতে ঘণ্টা খানিক সময় আছে।'

'পাঁচ মিনিটও আমার লাগবে না—তিন মিনিটে কেনা শেষ করে ফেলব।'

অয়ন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনে মনে আশা করতে লাগল তিন মিনিটে নিশ্চয়ই কেনা কাটা শেষ হবে না। মেয়েদের পক্ষে তা একেবারেই অসম্ভব। মুনা অসম্ভবই সম্ভব করল। দুই মিনিটের ভেতর একটা প্যাকেট হাতে দোকান থেকে বের হয়ে বলল, চলুন যাই।

'কেনা শেষ?'

'হুঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি কি কিনলে?'

'আগে থেকে পছন্দ করা ছিল, শুধু টাকাটা দিলাম। এখন আপনি যেখানে যেতে চান—চলে যান, আমি আজিমপুর রীতাদের বাসায় যাব।'

'ইয়ে চা খাবে না-কি? এখানে একটা রেস্টুরেন্টে খুবই ভালো চা বানায়।'

'ভালো চা আপনি খান। আমার চা খাওয়ার শখ নেই। যাই কেমন? ও আচ্ছা ধরুন, আপনার জন্যে একটা চিঠি আছে।'

অয়ন বিস্মিত হয়ে বলল, চিঠি?

'হ্যাঁ চিঠি। আর এই প্যাকেটটা রাখুন। এ রকম ট্যারা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকবেন না। দেখতে বিশ্রী লাগছে।'

হতচকিত অয়নের হাতে প্যাকেট এবং চিঠি দিয়ে মুনা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। সংক্ষিপ্ত চিঠি। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা।

অয়ন ভোই,

আপনি পুরো শীতকালটা হাফ হাতা একটা স্যুয়েটার (তাও ফুটো হওয়া) পরে কাটালেন। এই একই স্যুয়েটার আপনি গত শীতেও পরেছেন। আমার খুব কষ্ট হয়। আপনাকে ভালো কটা স্যুয়েটার উপহার দিলাম। সেন্ট মার্টিনে যখন যাবেন তখন সেটা যেন গায়ে থাকে।

মুনা।

পুনশ্চ ঃ যতই দিন যাচ্ছে আপনি ততই বাঁটু হচ্ছেন। ব্যাপার কি বলুনতো?

প্যাকেটের ভেতর হালকা আকাশী রং এর একটা ফুল হাতা স্যুয়েটার। যেন দূর আকাশের ছোট্ট একটা অংশ সাদা রং এর পলিথিনের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। অয়নের কেমন যেন লাগছে। জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে। শরীরে এক ধরনের কম্পন। কেন জানি শুধু মার কথা মনে পড়ছে, পনেরো বছর আগে যিনি মারা গেছেন তাঁর কথা হঠাৎ মনে পড়ছে কেন? যিনি খুব শখ করে তার নাম রেখেছিলেন 'অয়ন'। সেই মধুর নামে আজ আর কেউ তাকে ডাকে না। খাওয়ার শেষে কেউ বলে না, অয়ন বাবা পেট ভরেছে? খেয়েছিস ভালো করে?

অয়নের চোখে পানি এসে গেছে।

সে সেই অশ্রুজল গোপন করার কোনো চেষ্টত্ব করল না। কিছু কিছু চোখের জলে অহংকার ও আনন্দ মেশা থাকে, সেই জল গোপন করার প্রয়োজন পড়ে না।

মুনা বাড়িতে পা দেয়া মাত্র ফরিদা ভীত গলায় বললেন, পাউডারের কৌটায় এক হাজার টাকা ছিল। টাকাটা পাচ্ছি না—কি হয়েছে বলতো?

মুনা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ক্ষীণ স্বরে বলল, সেকি।

ফরিদা বললেন, আমারতো মা হাত পা কাঁপছে এখন কি করি?

'ভালো করে খুঁজে দেখেছ? চলতো দেখি আমিও খুঁজি।'

ফরিদা বললেন, একটা ঠিকা ঝি রেখেছিলাম না? আমার মনে হয় ঐ নিয়ে গেছে।

'সেতো গেছে দশদিন আগে এর মধ্যে তুমি খুঁজে দেখনি?'

'না।'

'আজেবাজে জায়গায় তুমি টাকা রাখ কেন মা? পাউডারের কৌটায় কেউ টাকা রাখে? কোথায় ছিল কৌটা?'

'কি হবে বলতো মুনা? সঞ্জুকে দেব টাকাটা। সেতো এখনি চাইবে।'

মুনার মুখ ছাই বর্ণ হয়ে গেল। ভাইয়া, ভাইয়া যেতে পারবে না? সে টাকা

চুরি করেছে বলে তার ভাইয়া যেতে পারবে না? সেতো টাকা চুরিও করে নি। ধার নিয়েছে। আগামী মাসের মাঝা মাঝি স্কলারশীপের পনেরশ টাকা পাবে। সে ঠিক করে রেখেছিল টাকাটা পাওয়ামাত্র সে পনের শ টাকাই মার কৌটায় রেখে দেবে। মা' একদিন কৌটা খুলে অবাক হয়ে বলবেন, ও মুনা দুইটা পাঁচশ টাকার নোট রেখেছিলাম এখন দেখি পনের শ টাকা। ব্যাপারটা কি বলতো?

সে বলবে, কি যে তুমি বল মা। টাকা কি আর ডিম দেয়। তুমি পনের শো রেখেছিলে।

'উঁহু। আমি রেখেছি আমি জানি না?'

'তাহলে নিশ্চয় ভৌতিক কাণ্ড। কোন পরোপকারী ভূত কিংবা পেত্নী হয়ত রেখে গেছে।'

'তুই রাখিস নি তো?'

'আমি? আমি রাখব কি ভাবে? আমি কি টাকা পাই? হেঁটে হেঁটে কলেজ করি। লোকজনদের ধাক্কা খেতে খেতে কলেজে যাওয়া ফিরে আসা। কি যে বিশ্রী তুমি তো জান না।'

ফরিদা বললেন, এখন কি করি মুনা বলতো?

মুনা বলল, বাবার কাছে নেই?

'উনার কাছে থাকবে কোত্থেকে? উনিতো বেতন পেয়েই সব টাকা আমার কাছে এনে দেন।'

'তাহলে কি বড় মামার অফিসে চলে যাব। বড় মামাকে বলব?'

ফরিদা অকুলে কূল পেলেন। আগ্রহ নিয়ে বললেন, তাই কর মা তাই কর।

মুনা ঘর থেকে বেরুতেই সঞ্জু বলল, টাকাতো মা এখনো দিলে না।

ফরিদা বললেন, তুই যাবি সেই রাত দশটায় এখন টাকা দিয়ে কি করবি?

সঞ্জু শংকিত গলায় বলল, সত্যি করে বল মা। টাকার জোগাড় হয়েছে?

'হয়েছে রে বাবা হয়েছে।'

সঞ্জুর মুখ থেকে শংকার ভাব পুরোপুরি দূর হলো না। সে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল। ফরিদার মুখ শুকনো। তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন। হাসতে পারলেন না। কোনো রকমে বললেন, চা খাবি বাবা? চা বানিয়ে দেই?

৭

জরী দোতলার বারান্দায় চুল এলিয়ে বসে আছে।

শীতকালে রোদে বসে থাকতে এমন্ ভালো লাগে। আজ ইউনিভার্সিটিতে

ক্লাস ছিল। ভোরবেলাতেই বাবা বলে দিয়েছেন, যেতে হবে না।

সে বলেছে, আচ্ছা। কেন যেতে হবে না জিজ্ঞেস করে নি। এই বাড়ির কারো সঙ্গেই কথা বলতে তার ইচ্ছা করে না। বাবার সঙ্গে না, মায়ের সঙ্গে না, ছোট বোনের সঙ্গেও না। তার প্রায়ই মনে হয় সে যদি হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে পারত তাহলে কত চমৎকার হত। সিঙ্গেল সিটেড একটা রুম। সে একা থাকবে। নিজের মতো করে ঘরটা সাজাবে। তাকে বিরক্ত করার জন্যে কেউ থাকবে না। দুপুর রাতে তার ঘরে দরজা ধাক্কা দিয়ে মা বলবেন না—ও জরী তোর সঙ্গে ঘুমুব। তোর বাবা বিশ্রী ঝগড়া করছে। জরীকে দরজা খুলে বলতে হবে না, সে কি মা। কেঁদো না। দুপুর রাতে এ রকম শব্দ করে কাঁদতে আছে? বাড়ির সবাইকে তুমি জাগাবে।

'তোর বাবা আমাকে কুত্তী বলে গাল দিয়েছে।'

'চুপ কর মা, ছিঃ। গাল দিলেও কি নিজের মেয়ের কাছে বলতে আছে?'

'তোকে না বললে কাকে বলব?'

'অনেক কথা আছে কাউকেই বলতে হয় না। আমি কি আমার সব কথা তোমাকে বলি? কখনো বলি না। কোনদিন বলবও না।'

এটা খুবই সত্যি কথা জরী তার নিজের কথা কাউকেই বলে না। মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মনে হয় এমন এক জন কেউ যদি থাকতো যাকে সব কথা বলা যায়।

রোদে বসে জরী তাই ভাবছিল। তার হাতে একটা ম্যাগাজিন। মাঝে মাঝে সে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাচ্ছে, তবে সে কিছু দেখছেও না পড়ছেও না। হাতে একটা ম্যাগাজিন থাকার অনেক সুবিধা, কেউ এলে ম্যাগাজিন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া যাবে। কথাবার্তায় যোগ দিতে হবে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারবে—এখন একটা মজার জিনিস পড়ছি। পরে কথা বলব।

জরীর মা মনোয়ারা দোতলায় উঠে এলেন। খানিকটা উত্তেজিত গলায় বললেন, জামাই এসেছে। জামাই।

জরী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাতে লাগল। যেন সে কিছু শুনতে পায় নি।

'জামাই এসেছে। নিচে বসে আছে।'

জরী শীতল গলায় বলল, জামাই বলছ কেন মা? বিয়ে এখনো হয় নি। বিয়ে হোক তারপর বলবে।

'তুই শাড়িটা বদলে নিচে যা।'

'কেন?'

'তোকে নিয়ে বাইরে কোথায় যেন খেতে যাবে বলছে।'

জরী তাকিয়ে রইল। তার খুব রাগ লাগছে। যদিও রাগ করার তেমন কোনো কারণ নেই। এক মাস পর যে ছেলের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে সে যদি তাকে নিয়ে এক দুপুরে বাইরে খেতে যেতে চায় তাতে দোষ ধরার কিছু নেই। এটাই তো স্বাভাবিক।

মনোয়ারা বললেন, জামাই পরশু রাতেও এসেছিল। তুই তোর কোন এক বন্ধুর বাসায় ছিলি। শুনে খুব রাগ করল।

জরী বলল, রাগ করল মানে?

'না রাগ না ঠিক ঐ বলছিল আর কি—এই বয়েসী মেয়েদের বন্ধুবান্ধবদের বাসায় রাত কাটানো ঠিক না।'

'তুমি কি বললে?'

'আমি কি বলব? আমার সঙ্গেতো কথা হয়নি তোর বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে।'

'বাবাকে সে উপদেশ দিল?'

'তুই সবার কথার এমন প্যাঁচ ধরিস কেন? উপদেশ না। কথার কথা বলেছে। আয় মা চট করে শাড়িটা বদলে আয়।'

'আমি যেতে পারব না।'

'এটা কেমন কথা।'

'যেতে ইচ্ছা করছে না মা।'

'তোর বড় চাচা নিচে বসে আছেন। উনি শুনলে রাগ করবেন।'

জরী উঠে দাঁড়াল। মনোয়ারা বললেন, আয় আমি চুলটা আঁচড়ে দেই। তুই শাড়িটা বদলা। গোলাপী জামাদানীটা পর। তোর চাচীর মুক্তার দুল জোড়া পরবি? নিয়ে আসব?

'নিয়ে এসো।'

মনোয়ারা ছুটে গেলেন। মেয়েকে অতি দ্রুত সাজিয়ে দিতে হবে নয়ত জরীর বড় চাচা রাগ করবেন। যাঁর আশ্রয়ে বাস করছেন তাঁকে রাগানো ঠিক হবে না। কিছুতেই ঠিক হবে না। আজ যদি তিনি বলেন, অনেক দিনতো হলো এখন তোমরা নিজেরা একটা ব্যবস্থা দেখ। তখন কি হবে? কোথায় যাবেন তিনি? অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে কার ঘরে উঠবেন?

জরী বেশ যত্ন করে সাজল। কানে দুল পরল। চোখে হালকা করে কাজল দিল। তার চোখ এম্নিতেও সুন্দর, কাজল দেয়ার কোনোই প্রয়োজন নেই। তবু কাজল দিলেই চোখে একটা হরিণ হরিণ ভাব চলে আসে। অবশ্যি সে জানে বসার ঘরের সোফায় বসে অতি দ্রুত যে লোকটি পা নাড়াচ্ছে সে ভুলেও তার চোখের

দিকে তাকাবে না। পৃথিবীতে দুই ধরনের পুরুষ আছে। এক ধরনের পুরুষ তাকায় মেয়েদের দিকে। চোখের ভাষা পড়তে চেষ্টা করে। অন্য দল তাকায় শরীরের দিকে।

মনিরুদ্দিন আজ থ্রী পিস স্যুট পরে এসেছে। গা দিয়ে ভুর ভুর করে সেন্টের গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই গন্ধের সঙ্গে মিশেছে জর্দার কড়া গন্ধ। তার মুখ ভর্তি পান। পানের লাল রসের খানিকটা ঠোঁটের উপর জমা হয়ে আছে। সে অতি দ্রুত পা নাড়াচ্ছে। জরীকে ঢুকতে দেখে সে তাকাল। সেই দৃষ্টি কয়েকবার পা থেকে মাথা পর্যন্ত নড়াচড়া করল। জরীর চাচা বলল, বস মা।

মনিরুদ্দিন বলল, চাচাজানের সঙ্গে দেশের অবস্থা নিয়ে কথা বলছিলাম। এই দেশে ভদ্রলোকের ব্যবসা করা সম্ভব না। যারা জেনুইন ব্যবসা করে তাদের জন্যে এই দেশ না। দালালদের জন্যে এই দেশ।

জরীর চাচা বললেন, খুবই সত্য কথা।

মনিরুদ্দিন বলল, কি আছে এই দেশে বলেন দেখি চাচাজান। সামান্য অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসার জন্যে যেতে হয় ব্যাংকক। চিকিৎসা বলে এক জিনিস এই দেশে নাই।

'ঠিক বলেছ।'

'তারপর ধরেন এড়ুকেশন। এড়ুকেশনের 'এ'টাও এদেশে নাই।'

জরী মনে মনে বলল, এড়ুকেশনের 'ই'। এ নয়।

'পলিটিকসের কথা যদি ধরেন চাচাজান তাহলে বলার কিছুই নাই।'

'খুবই সত্যি কথা।'

'বুঝলেন চাচাজান পুরো বঙ্গোপসাগরটা যদি তেল হয়ে যায় তবু এই দেশের কোনো উন্নতি হবে না। দশজন লুটে পুটে খাবে।'

'কারেক্ট।'

মনিরুদ্দিন উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, ওকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি।

'আচ্ছা বাবা যাও।'

জরী উঠে দাঁড়াল। জর্দার কড়া গন্ধে তার মাথা ধরে গেছে। বমি বমি আসছে।

বাসার সামনে বিশাল লাল রং এর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। খাকি পোষাক এবং মাথায় টুপি পরা এক জন ড্রাইভার।

মুনিরুদ্দিন গাড়িতে উঠেই বলল, কুদ্দুস রবীন্দ্র সংগীত দাওতো। আমার আবার গাড়িতে রবীন্দ্রসংগীত ছাড়া কিছু ভালো লাগে না। আর শোন কুদ্দুস স্লো চালাবে।

কুদ্দুস রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট চালু করল। মনিরুদ্দিন জরীর দিকে তাকিয়ে বলল, খানিকটা ঘুরাঘুরি করি।

জরী বলল, জ্বী আচ্ছা।

'চীন বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ ব্রিজ দেখেছ?'

'না।'

'কুদ্দুস ঐ খানে চলতো।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। পেছনের সীটে এত জায়গা তবু সে বসেছে জরীর সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে। জরী এখন তার গায়ের ঘামের গন্ধ পাচ্ছে।

মনিরুদ্দিন তার ডান হাত জরীর হাটুর উপর রেখেছে। গানের তালে তালে সেই হাতে তাল দিচ্ছে।

'পরশু দিন রাতে কোথায় ছিলেন?'

'আমার এক বন্ধুর বাসায়।'

'উচিত না।'

'উচিত না কেন?'

'বন্ধু বান্ধব থাকা ভালো। গল্প গুজব করাও ভালো। তাই বলে রাতে থেকে যাওয়া ঠিক না।'

জরী প্রাণপণ চেষ্টা করছে পাশে বসে থাকা মানুষটিকে ভুলে গিয়ে গানে মন দিতে। যেন গানটিই সত্যি। আশে পাশের জগৎ সত্যি নয়। অরুন্ধতী হোম চৌধুরী কি অপূর্ব গলা।

মুখ পানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে।।

মনিরুদ্দিন একটি হাত জরীর কাঁধে তুলে দিয়েছে। পায়ের উপর থেকে সেই হাত কাঁধে উঠে এসেছে। জরী খুব চেষ্টা করছে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে। যা হবার হোক।

মনিরুদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বলল, একটু এদিকে সরে বস তাহলেই ড্রাইভার ব্যাকভিউ মিররে কিছু দেখবে না। এ রকম শক্ত হয়ে আছ কেন?

মনিরুদ্দিন জরীর বুক স্পর্শ করল।

জরী শিউরে উঠল।

মনিরুদ্দিন অভয়ের হাসি হেসে বলল, গাড়ির কাঁচ টিনটেড। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

জরী চেঁচিয়ে বলল, ড্রাইভার সাহেব গাড়ি থামান। আমি নামব। থামান বলছি। এক্ষুণি থামান। এক্ষুণি।

ড্রাইভার আচমকা ব্রেক কষে গাড়ি থামাল।

জরী হকচকিয়ে যাওয়া মনিরুদ্দিনের দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, আপনি একটি কথাও বলবেন না। আমি এই খানে নেমে যাব। আপনি যদি বাধা দিতে চেষ্টা করেন আমি চিৎকার করে লোক জড় করব।

'তুমি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'আমি দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'কি বলছ তুমি? দারুচিনি দ্বীপ কি?'

'আপনি বুঝবেন না।'

জরী গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়ল।

জরী সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরল।

জরীর মা সম্ভবত সারাক্ষণই গেটের দিকে তাকিয়েছিলেন। তিনি ছুটে এসে মেয়ের হাত ধরে ভীত গলায় বললেন, কি হয়েছেরে মা, কি হয়েছে?

জরী সহজ গলায় বলল, কিছু হয়নিতো।

'জামাই তোর বড় চাচাকে টেলিফোন করেছিল। তুই নাকি রাগারাগি করে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে নেমে গেছিস। জামাইকে খারাপ খারাপ কথা বলেছিস। অপমান করেছিস। জামাই অসম্ভব রাগ করেছে।'

'রাগ করলে কি আর করা।'

'তোর চাচাও রাগ করছে। খুবই রাগ করেছে। বসে আছে তোর জন্যে।'

জরী বলল, মা তোমার কাছে টাকা আছে? আমাকে দেবে। আমি পালিয়ে যাব মা।

'কি বলছিস পাগলের মতো? আয় ভেতরে আয়। কি হয়েছে বলতো। চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে গেলি কেন? যদি এ্যাকসিডেন্ট হত?

'চলন্ত গাড়ি থেকে নামি নি।'

'হয়েছিল কি?'

'কিছু হয় নি।'

তোর বাবা টেলিফোন আসার পর থেকে ছটফট করছেন। তাঁর অসুখ খুব বেড়েছে। আয় প্রথমে তোর বাবার কাছে আয়।

জরীর বাবা হাঁপানির প্রবল আক্রমণে নীল বর্ণ হয়ে গেছেন। বিছানায় পড়ে আছেন চোখ বন্ধ করে। নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় তাঁর বুক উঠা নামা করছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছেন না। জরীর ছোট বোন বাবার মাথার কাছে মুখ কাল করে

বসে আছে। জরী স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল— এত কষ্ট, এত কষ্ট। এত কষ্টের কোনো মানে হয়? কোন অর্থ হয়?

জরীর বাবা একবার চোখ তুলে তাকালেন। পরমুহূর্তেই চোখ বন্ধ করে আগের মতোই ছটফট করতে লাগলেন। জরীর মা ফিস ফিস করে বললেন, জামাই-এর টেলিফোনের খবর শোনার পর শ্বাস কষ্ট শুরু হলো।

জরী এই ঘরে আর থাকতে পারছে না। এই কষ্ট দাঁড়িয়ে দেখা সম্ভব নয়। সে এগিয়ে এসে বাবার মাথায় হাত রাখল। তিনি চোখ মেললেন এবং জরীকে অবাক করে দিয়ে হাসার চেষ্টা করলেন। যেন মেয়েকে দেখে খুশি হয়েছেন।

জরী বলল, বাবা আমি ভালো আছি।

তিনি মাথা নাড়লেন।

মনে হচ্ছে তাঁর কষ্ট খানিকটা কমে এসেছে। বুক আগের মতো উঠা নামা করছে না। ওষুধ দেয়া হয়েছিল সেই ওষুধ হয়ত বা কাজ করতে শুরু করেছে। শ্বাসনালীর প্রদাহ কমার দিকে। জরী আবার বলল, বাবা আমি ভালো আছি।

তিনি ইশারা করে সবাইকে চলে যেতে বললেন, এর অর্থ তাঁর কষ্ট এখন সত্যি সত্যি কমার দিকে। কষ্টটা কমলেই তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। সম্ভবত তাঁর ঘুম আসছে। সবাই ঘর খালি করে বের হয়ে এল।

জরীর বড় চাচা ইউসুফ সাহেব বসে আছেন থমথমে মুখে।

তাঁর সামনেই জরীর মা এবং জরী।

কথাবার্তা এখনো শুরু হয় নি। ইউসুফ সাহেব চা খাচ্ছেন। কি বলবেন এবং কি ভাবে বলবেন তা হয়ত ঠিক করছেন। মেয়েটার শান্ত মুখের দিকে যতবার তাকাচ্ছেন ততবারই তাঁর রাগ উঠে যাচ্ছে। এতবড় ঘটনার পর মেয়েটা এ রকম শান্ত মুখে বসে আছে কি করে? সে ভাবে কি নিজেকে?

তিনি কিছু বলার আগেই জরী বলল, চাচা আমি ঐ লোকটাকে বিয়ে করব না।

ইউসুফ সাহেব জরীর সাহস ও স্পর্ধা দেখে চমকে গেলেন। তিনি রাগ সামলে নীচু গলায় বললেন, বিয়ে করবে, কি করবে না এই কথা আমি জিজ্ঞেস করি নি। আগ বাড়িয়ে কথা বলছ কেন? কি ভাব নিজেকে? আমি যা জিজ্ঞেস করি তার জবাব দেবে। কি হয়েছিল যে তুমি চলন্ত গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নামলে?

জরী চুপ করে রইল।

'তুমি যে ছেলেটাকে অপমান করলে তুমি এদের ক্ষমতা জান? এদের অর্থ বিত্তের খবর রাখ? সে কি করেছে যে তাকে গালাগালি করে লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে

নামবে। চিৎকার করে লোক জড় করবে?'

'আমি চিৎকার করে লোক জড় করি নি।'

'তুমি বলতে চাও সে মিথ্যা কথা বলছে? কথা বলছ না কেন? না-কি বলার মতো কথা পাচ্ছ না?'

ইউসুফ সাহেব জরীকে তুই করে বলেন, আজ তুমি বলছেন। এতে রাগ প্রকাশ পাচ্ছে এবং দূরত্বও প্রকাশ পাচ্ছে।

'শোন জরী, মনির সব কথাই আমাকে বলেছে। কিছুই গোপন করে নি।'

'কি বলেছে?'

'তোমার সঙ্গে এই নিয়ে ডিসকাস করা উচিত না তবু তুমি যখন শুনতে চাচ্ছ তখন বলছি— সে তার ভাবি স্ত্রীর হাত ধরেছে— এটা এমন কি অপরাধ? আমি যতদূর জানি তোমরা ক্লাসের ছেলের হাত ধরাধরি করে হাঁট। তখন অপরাধ হয় না? তারা কি পরিমাণ রাগ করেছে তা-কি তুমি জান? মুনির টেলিফোনে কাঁদছিল। মুনিরের বাবা টেলিফোন করেছেন, মুনিরের এক মামা পুলিশের এ আই জি উনি টেলিফোন করেছেন। জিয়ার আমলে পাটমন্ত্রী ছিলেন যে ভদ্রলোক উনিও টেলিফোন করেছেন।'

জরীর মা ক্ষীণ গলায় বললেন, এখন কি করা?

ইউসুফ সাহেব বললেন, এইটা নিয়েই চিন্তা করছি। মুনিরের বাবার সঙ্গে কথা হলো।

জরী বলল, কি কথা হলো?

'তোমার তা শোনার দরকার নেই। তুমি ঘরে যাও।'

জরী উঠে চলে গেল।

ইউসুফ সাহেব বললেন, মুনিরের বাবা বলেছেন তাঁরা কাজী ডাকিয়ে বিয়ে পড়িয়ে দিতে চান। দেরী করতে চান না, কারণ ছেলে খুব মন খারাপ করেছে।

জরীর মা বললেন, বিয়ের পর ওরা আমার মেয়েটাকে কষ্ট দিবে।

'কষ্ট দিবে কি জন্যে? বিয়ে হয়ে গেলে সব সমস্যার সমাধান। আর একবার বিয়ে হয়ে গেলে কেউ কিছু মনে রাখবে না।'

'বিয়ে কখন হবে?'

'ওরা পঞ্জিকা টঞ্জিকা দেখছে। যদি দিন শুভ হয় আজ রাতেও হতে পারে।'

'এইসব কি বলছেন ভাইজান।'

'চিন্তা ভাবনা করেই বলছি। চিন্তা ভাবনা ছাড়া কাজ করা আমার স্বভাব না। জরী যে কাণ্ড করেছে তারপর এ ছাড়া অন্য পথ নেই।'

'মেয়েটার মত নাই।'

'বাজে কথা বলবে না। মত নাই আগে বলল না কেন? এনগেজমেন্টের আগে বলতে পারল না? জরীকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। ওদের টেলিফোন আগে পাই ওরা যদি আজ রাতে বিয়ের কথা বলে তখন আমি জরীকে বুঝিয়ে বলব।'

জরীর মা ক্ষীণ গলায় বললেন, আরো কয়েকটা দিন সময় দিলে মেয়েটা ঠাণ্ডা হত।

'আমার মতে আর এক মুহূর্ত সময়ও দেয়া উচিত না। সময় দিলে ক্ষতি। বিরাট ক্ষতি। ওদের কিছু না, ক্ষতি আমাদের...।

ইউসুফ সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই টেলিফোন এল। মুনিরুদ্দিনের বাবা টেলিফোন করেছেন। সবার সাথে কথা টথা বলে ঠিক করেছেন-বিয়ে আজ রাতেই পড়ানো হবে। রাত দশটার মধ্যে বিয়ে পড়ানো হবে। এগারটার দিকে তারা বৌ নিয়ে চলে যাবেন। সামনের সপ্তাহে হোটেল সোনারগাঁয়ে রিসিপশন।

ইউসুফ সাহেব জরীর মাকে বললেন, তুমি তোমার গুণবতী মেয়েকে আমার কাছে পাঠাও।

'ভাইজান একটা বিষয় যদি বিবেচনা করেন।'

'সব দিক বিবেচনা করা হয়েছে। বিবেচনার আর কিছু বাকি নেই।'

৮

মনসুর আলি সাহেব বাগানে গোলাপ গাছের কাছে খুপড়ি হাতে বসেছিলেন। পাঁচটি গোলাপ এই গাছটায় একসঙ্গে ফুটেছে। টকটকে লাল গোলাপ। মনে হচ্ছে গাছে যেন আগুন লেগে গেছে। গাছটা যেন আনন্দ, গর্ব এবং অহংকারের সঙ্গে উঁচু গলায় বলছে দেখ তোমরা আমাকে দেখ।

এ রকম একটা গাছের একটু যত্ন নিজের হাতে না করলে ভালো লাগে না। মনসুর সাহেব মাটি আলগা করে দিচ্ছেন। মাটির ফাঁকে ফাঁকে যেন গাছের জীবনদায়িনী নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে যেতে পারে।

মেঘবতী এগিয়ে এল। খুব ধীর পায়ে আসছে। বেচারীর শরীর ভালো না। কাল রাতে সে কিছুই খায় নি। খাবার খানিকক্ষণ শুঁকে নিজের জায়গায় চলে এসেছে। দুটি থাবার মাঝখানে মুখ রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিনি মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে হালকা গলায় বললেন, আয় আয়। দেখ ফুলের বাহার দেখ।

মেঘবতী কাছে এসে তাঁর পাঞ্জাবীর এক কোণ কামড়ে ধরে চুপ করে বসে রইল। তিনি মাটি কুপিয়ে দিতে লাগলেন। বড় ভালো লাগছে। শীতের সকালের

এই চমৎকার রোদ, ফুলের গন্ধ, গা ঘেঁষে বসে থাকা প্রিয় প্রাণী। এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দের যোগফল বিরাট একটি সংখ্যা। সেই সংখ্যা অসীমের কাছাকাছি।

মনসুর সাহেব খুড়পি নামিয়ে পাঞ্জাবীর পকেটে চুরুটের জন্যে হাত দিলেন। মেঘবতী পাঞ্জাবীর পকেট এখনো কামড়ে ধরে আছে।

'মেঘবতী, ছাড়তো দেখি, চুরুট নেব।'

মেঘবতী ছাড়ল না।

তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। কিছুক্ষণ তাঁর চোখে পলক পড়ল না। মেঘবতী মরে পড়ে আছে। মৃত্যুর আগে আগে সে কিছু একটা বলতে এসেছিল। বলতে পারে নি। পরম মঙ্গলময় ঈশ্বর তার হৃদয়ে ভালোবাসা দিয়েছিলেন, মুখে ভাষা দেন নি। মৃত্যুর আগে আগে যে কথাটি সে বলতে এসেছিল তা বলতে পারে নি। সে তার প্রভুর পাঞ্জাবীর পকেট কামড়ে ধরে অচেনা অজানার দিকে যাত্রা করেছে।

মনসুর সাহেব ভাঙ্গা গলায় ডাকলেন, আনুশ্‌কা। আনুশ্‌কা। আনুশ্‌কাকে ডাকতে গিয়ে তার গলা ভেঙ্গে গেল।

আনুশ্‌কা ছুটে এল।

মনসুর সাহেব ভাঙ্গা গলায় বললেন, তোমার মেঘবতীর গায়ে একটু হাত রাখ মা।

আনুশ্‌কা কয়েক পলক মেঘবতীর দিকে তাকিয়ে ছুটে গেল নিজের ঘরের দিকে।

এই বিশাল বাড়িতে সে ছিল নিঃসঙ্গ। মেঘবতী তাকে সঙ্গ দিয়েছে। কত রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে ভয় পেয়ে ডেকেছে, মেঘবতী।

ওম্নি জানালার কাছে মেঘবতীর গর্জন শোনা গেছে। সে জানিয়ে গেছে— আছি আমি আছি। তোমার মা তোমাকে ছেড়ে চলে গেছেন, তোমার বাবা ঘুরছেন জাহাজে জাহাজে, কিন্তু আমি আছি। আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত থাকব। আমি পশু, আমি মানুষের মতো প্রিয়জনদের ছেড়ে যাওয়া শিখি নি।

আনুশ্‌কা ফুলে ফুলে কাঁদছে।

মনসুর সাহেব আনুশ্‌কার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

'মা এমন করে কাঁদলে চলবে? রাত ন'টা বাজে। আজ না তোমাদের দারুচিনি দ্বীপে যাবার কথা।'

'আমি কোথাও যাব না।'

'তাতো হয় না মা। তুমি না গেলে তোমার বান্ধবীরা যাবে না। তোমার একার

কষ্টের জন্যে তুমি অন্যদের কষ্ট দিতে পার না। সেই অধিকার তোমার নেই মা।'

'বললামতো আমি যাব না।'

'তুমি মানুষ হয়ে জন্মেছ মা। মানুষ শুধু একার জন্যে বাঁচে না— মানুষ অন্যদের জন্যেও বাঁচে। এইখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর আনন্দ। এইখানেই মানুষ হয়ে জন্মানোর দুঃখ। মা উঠ। তোমার বান্ধবীরা সব মুখ কালো করে বসে আছে।'

আনুশ্কা নড়ল না।

মনসুর সাহেব বললেন, তোমার মা যেদিন হঠাৎ করে এসে আমাকে বলল, আমি তোমার সঙ্গে বাস করতে পারছি না। আমি চলে যাচ্ছি। সেদিনও আমি কিন্তু ঠিক সময়ে অফিসে গিয়েছি। মা, তুমিতো আমার মেয়ে। আমার মেয়ে না?

'হ্যাঁ আমি তোমারই মেয়ে।'

তাহলে তুমি ওঠো তো।

আনুশ্কা উঠে বসল। মনসুর সাহেব বললেন, তোমার আনন্দ তুমি সবাইকে দেখাবে। দুঃখ কাউকে দেখাবে না। তোমার মা আমাকে ছেড়ে যাওয়ায় আমি যে দুঃখ পেয়েছিলাম তা কি কখনো কাউকে দেখিয়েছি? আমার এত প্রিয় যে মেয়ে তার কাছেও আজ মাত্র স্বীকার করলাম।

আনুশকা চোখ মুছে বন্ধুদের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল, এখনো অনেক সময় আছে। চলতো সবাই ছাদে খানিকক্ষণ হৈ চৈ করে আসি।

৯

ফরিদা হাসি মুখে বললেন, এই নে তোর টাকা গুণে দেখ এক হাজার আছে কি-না। এখন খুশি?

তাঁর মুখে হাসি। তিনি মনের আনন্দ চেপে রাখতে পারছেন না। মুনা তার বড় মামার কাছে চাওয়া মাত্র টাকা পেয়েছে। কোনো সমস্যা হয় নি।

'কি গুণে দেখলি না?'

সঞ্জু বলল, কি আশ্চর্য গুণে দেখতে হবে কেন? ভাত দিয়ে দাও মা।

'মাত্র আটটা বাজে। এখনি ভাত খাবি কি? তোর ট্রেন সেইতো রাত সাড়ে দশটা।'

'একটু আগে আগে যাওয়া দরকার। টিকিটের ঝামেলা আছে।'

'তোর বাবাওতো সঙ্গে যাবে।'

সঞ্জু বিস্মিত হয়ে বলল, বাবা যাবে মানে? তাঁর যাওয়ার দরকার কি?

'যেতে চাচ্ছে যাক না। তুই বিরক্ত হচ্ছিস কেন?'

'সবাই বলবে কি? ট্রেনে তুলে দিতে বাবা চলে এসেছেন। আমি কি কচি খোকা না-কি? না মা তোমার পায়ে পড়ি, যে ভাবেই হোক তুমি সামলাও। প্লীজ।'

'বেচারা এত আগ্রহ করে যেতে চাচ্ছে।'

'না-মা, না, প্লীজ। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এম্নিতেই ওরা আমাকে খোকা বাবু ডাকে।'

'খোকা বাবু ডাকে?'

'হুঁ। কেনইবা ডাকবে না। ইউনিভার্সিটির সব ক'টা পরীক্ষার সময় বাবা উপস্থিত। হাতে কাটা ডাব। পরীক্ষা দিয়ে এসেই ডাব খেতে হবে। কি রকম লজ্জার ব্যাপার বলতো।'

'লজ্জার কি আছে? ডাবের পানিতে পেটটা ঠাণ্ডা থাকে।'

'উফ মা তুমি বুঝবে না। তুমি বাবাকে সামলাও।'

'আচ্ছা দেখি বলে দেখি।'

মুনা এসে বলল, ভাইয়া বাবা তোমাকে ডাকছেন।

সঞ্জু বাবার ঘরের দিকে রওনা হলো। আবারো হয়ত খানিকক্ষণ ইরাকের যুদ্ধের কথা শুনতে হবে। বাবার ঘরে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বাবার সঙ্গে তার বলার কোনো কথা নেই। মাঝে মাঝে সে মনেও করতে পারে না বাবাকে আপনি করে বলে না তুমি করে বলে। কলেজে যখন পড়ে তখন একদিন বাবা তাকে ডেকে বললেন, তুই আজ আমার অফিসে একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারবি?

সঞ্জু বলল, জ্বি স্যার পারব।

সোবাহান সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, স্যার বলছিস কেন?

সঞ্জু কোন জবাব দিতে পারে নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল।

এখনো সে ঐদিনকার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব বললেন, বোস।

সঞ্জু বসল।

'টাকা পয়সা কি লাগবে বললি নাতো।'

'মা টাকা দিয়েছে।'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে আছে নে আরো দু'শ টাকা রেখে দে।'

'লাগবে না বাবা।'

'রেখে দে।'

'লাগবে না। মা এক হাজার টাকা দিয়েছে।'

সোবাহান সাহেবের মন একটু খারাপ হলো। তিনি ভেবেছিলেন, বাড়তি দু'শ টাকা পেয়ে ছেলে খুশি হবে। তিনি তার আনন্দিত মুখ দেখবেন।

'সঞ্জু তোর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে কেউ সিগারেট খায়?'

সঞ্জু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল। এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার মানে কি সে বুঝতে পারছে না। সোবাহান সাহেব বিব্রত গলায় বললেন, আমার অফিসের এক কলিগ ঐ দিন আমাকে এক প্যাকেট ডানহিল সিগারেট দিল। আমিতো সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি। প্যাকেটটা পড়ে আছে। তোর বন্ধু বান্ধবদের জন্যে নিয়ে যাবি? অবশ্য সিগারেট খাওয়া ভালো না। বদ অভ্যাস।

সঞ্জু মিথ্যা করে বলল, কেউ সিগারেট খায় না বাবা।

'ও আচ্ছা। আচ্ছা তাহলে থাক। তোর ট্রেনতো সাড়ে দশটায়?'

'জ্বি।'

'আমি তুলে দিয়ে আসব, কোনো অসুবিধা নেই। সাড়ে ন'টার দিকে বেরুলেই হবে।'

'আপনার যেতে হবে না বাবা।'

সোবাহান সাহেব আর কিছু বললেন না। পত্রিকা চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সঞ্জু বাবার ঘর থেকে বের হয়ে মনে মনে বলল, বাঁচলাম।

১০

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন।

শুভ্র এসে বলল, বাবা আমি যাচ্ছি।

ইয়াজউদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন যাচ্ছ মানে? এখন বাজে রাত ন'টা। গাড়িতে স্টেশনে যেতে তোমার সময় লাগবে পাঁচ মিনিট।

'আমাদের সবারই একটু আগে যাবার কথা। তাছাড়া আমি গাড়ি নিচ্ছি না রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশা করে যাচ্ছ?'

'জ্বি।'

'কেন জানতে পারি?'

'নিজের মতো করে যেতে চাচ্ছি বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে গেলে বুঝি পরের মতো করে যাওয়া হবে?'

শুভ্র কিছু বলল না।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব বললেন, সত্যি করে বলতো, তুমি কি কোনো কারণে

আমার উপর বিরক্ত?

'বিরক্ত হব কেন?'

'প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের উত্তর আমার পছন্দ না। তুমি আমার উপর বিরক্ত কি বিরক্ত না সেটা বল। হ্যাঁ অথবা না।'

'হ্যাঁ।'

ইয়াজউদ্দিন অনেকক্ষণ ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুভ্র হ্যাঁ বলেছে এটা বিশ্বাস করতে তাঁর সময় লাগছে।

'তুমি বিরক্ত কেন?'

'এখনতো আমার সময় নেই বাবা পরে গুছিয়ে বলব।'

'স্টেশনে যেতে তোমার লাগবে পাঁচ মিনিট।'

'আমিতো রিকশা করে যাচ্ছি।'

'রিকশাতেও কুড়ি মিনিটের বেশি লাগার কথা না।'

শুভ্র স্বাভাবিক গলায় বলল, তোমার উপর কেন বিরক্ত সেটা বলতে আমার সময় লাগবে। আমি ফিরে এসে বলব।

'অনেক দীর্ঘ কথাও খুব সংক্ষেপে বলা যায়। তিন পাতার যে রচনা তার সাবসটেন্স সাধারণত দুই তিন লাইনের বেশি হয় না।'

শুভ্র বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমার উপর বিরক্ত কারণ তুমি আমাকে অবিকল তোমার মতো করতে চাও।

'সব বাবাই কি তাই চায় না?'

'চাওয়াটা ঠিক না। এটা চাওয়া মানে ছেলেদের উপর চাপ সৃষ্টি করা। অন্যায় প্রভাব ফেলা।'

'আমি তোমার উপর অন্যায় প্রভাব ফেলছি?'

'চেষ্টা করছ কিন্তু পারছ না।'

'মনে হচ্ছে মানুষ হিসেবে তুমি আমাকে তেমন পছন্দ কর না।'

'পছন্দ করি, কিন্তু তুমি সব সময় নিজকে অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান মনে কর। এটা আমার পছন্দ না।'

'তোমার ধারণা আমি অন্যদের চেয়ে বুদ্ধিমান নই?'

'আমার তাই ধারণা বাবা। তুমি অন্যদের চেয়ে কৌশলী, কিন্তু বুদ্ধিমান নও।'

'কিভাবে বুঝলে আমি বুদ্ধিমান নই?'

'এক জন বুদ্ধিমান মানুষ অন্যদের বুদ্ধি খাটো করে দেখে না। এক জন বোকা লোকই তা করে। তুমি সব সময় আমার বুদ্ধিকে খাটো করে দেখেছ।

মা'কে খাটো করে দেখেছ। আমি যে যথেষ্ট বুদ্ধিমান সেটা তুমি এখন বুঝতে পারছ– আগে না। এর আগ পর্যন্ত তোমার ধারণা ছিল আমি পড়ুয়া এক জন ছেলে। বই পত্র ছাড়া কিছুই বুঝি না। আমি জগতের বাইরে এক জন মানুষ যে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া ছাড়া আর কিছুই পারে না।'

'শুভ্র তুমি বস। তোমার সঙ্গে কথা বলি।'

'আমারতো সময় নেই বাবা।'

'এক কাজ করলে কেমন হয়। আমি বরং তোমার সঙ্গে রিকশা করে যাই। অনেক দিন রিকশা চড়া হয় না। যেতে যেতে কথা বলি।'

'আমি একাই যেতে চাই বাবা।'

'তোমার মনে যে এতটা চাপা ক্ষোভ ছিল তা আমি বুঝি নি।'

'বুদ্ধি কম বলেই বোঝ নি। অন্য যে কোন বাবা সেটা বুঝতেন।'

'আই এ্যাম সরি। আই এ্যাপোলোজাইজ।'

শুভ্র হেসে ফেলে বলল, এ্যাপোলোজি একসেপটেড। বাবা যাই।

'বন ভয়াজ মাই ডিয়ার সান। বন ভয়াজ।'

শুভ্র নিচু হয়ে বাবাকে পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেল। ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে তা করতে দিলেন না, জড়িয়ে ধরলেন।

শুভ্র বলল, আমি যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকি তাহলে ক্ষমা করে দিও। আমি তোমাকে অসম্ভব ভালোবাসি বাবা। এই ভালোবাসার মধ্যে কোনো রকম খাদ নেই। একজন মানুষ অন্য এক জনকে তার গুণের জন্যে ভালোবাসে। আমি ভালোবাসি তোমার দোষগুলোর জন্যে। তুমিই আমার দেখা একমাত্র মানুষ যার দোষগুলোকে গুণ বলে মনে হয়।

ইয়াজউদ্দিন সাহেব ছেলেকে রিকশায় তুলে দিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললেন, খুব ধীরে টেনে নিয়ে যাও। বলেই তাঁর কি মনে হলো তিনি বললেন, না ঠিক আছে তুমি যে ভাবে যাও সেভাবেই যাবে। ধীরে যেতে হবে না।

রিকশাওয়ালা উল্কার বেগে ছুটল। কমলাপুর রেলস্টেশানের কাছাকাছি এসে স্পীড-ব্রেকার ধাক্কা খেয়ে রিকশা উল্টে গেল। লোকজন ছুটে এসে শুভ্রকে টেনে তুলল। শুভ্র বলল, আমার কিছুই হয় নি শুধু চশমাটা ভেঙ্গে গেছে।

শুভ্র কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। আলো এবং ছায়া তার চোখে ভাসছে। চশমা ছাড়া সে সত্যি সত্যি অন্ধ।

শুভ্র বলল, আপনারা কেউ কি আমাকে দয়া করে কমলাপুর রেল স্টেশনে নিয়ে যাবেন। আমি চশমা ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। প্লীজ আপনারা কেউ আমাকে একটু সাহায্য করুন।

১১

জরী বিছানায় পা তুলে বসে আছে।

মনিরুদ্দিন, তাঁর বাবা এবং বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। বসার ঘরে সবার জায়গা হচ্ছে না। বারান্দায় কিছু বেতের চেয়ার দেয়া হয়েছে। সবাই নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন। মনিরুদ্দিন সৌদী আরবে সাদ্দামের বাহিনী ঢুকে পড়েছে এই খবরে খুবই উল্লাসিত। তিনি নীচু গলায় ভেতরের কিছু খবরও দিচ্ছেন। তেমন বাংলাদেশ টেলিভিশন যে বার বার বলছে সৌদী আরবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্য ভালো আছে এটা খুবই ভুল খবর। এরা আসল খবর দিচ্ছে না। আসল খবর হলো স্কার্ড মিজাইলে একাত্তর জন সোলজার শেষ। ঢাকা এয়ারপোর্টে কার্ফিউ দিয়ে এদের ডেড বডি আনা হয়েছে। এটা খুবই পাকা খবর।

সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। এক দফা চা হয়েছে। দ্বিতীয় দফা চায়ের অর্ডার দেয়া হয়েছে। বিয়ে পড়াতে সামান্য দেরী হবে। মগবাজারের কাজী সাহেব এখনো এসে পৌছান নি। তাঁকে আনতে গাড়ি গেছে।

বরপক্ষ ছেলের এক খালা বড় একটা স্যুটকেস নিয়ে এসেছেন। তিনি হাসি হাসি মুখে এ বাড়ির মেয়েদের স্যুটকেসের জিনিস দেখাচ্ছেন।

'হুট করে বিয়ে হচ্ছে এই জন্যেই ঘরে যা ছিল তাই আনা হয়েছে। গয়নার এই সেটটা আপনারা একটু দেখেন। কিছুক্ষণ আগে রেডিমেড কেনা হয়েছে। দাম পড়েছে আশি হাজার সাত শ। মোট পাঁচটা রিয়েল ডায়ামন্ড আছে। রিসিটও সঙ্গে এনেছি পছন্দ না হলে বদলে আনতে পারবেন।'

মেয়েরা চোখ বড় বড় করে জড়োয়া সেটের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকার মতোই জিনিস। ছেলের খালা বললেন, বিয়ে পড়ানো হোক। বিয়ে পড়ানো হবার পর মেয়ের গলায় এটা পরাবেন।

'জরীর বড় চাচী বললেন, আগে পরালে অসুবিধা কি?'

ভদ্রমহিলা শুকনো গলায় বললেন, আগে না। বিয়ে পড়ানো হোক।

জরীর বড়চাচী উঠে এলেন। ঢুকলেন জরীর ঘরে। জরী চাচীর দিকে তাকাল। কিছু বলল না। চাচীকে সে পছন্দ করে না। ভদ্র মহিলা খুব ঝগড়াটে। জরীরা যে এ বাড়ির আশ্রিত তা তিনি দিনের মধ্যে একবার জরীদের মনে করিয়ে দেন।

বড়চাচী তীক্ষ্ণগলায় বললেন, তুই আমাকে ঠিক করে বলতো জরী, তুই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলি কেন?

'বলতে ইচ্ছা করছে না চাচী।'

'ছেলেটাকে তোর খুব অপছন্দ হয়েছে?'

'জ্বি।'

'আমারও অপছন্দ হয়েছে। এরা ছোটলোকের ঝাড়। তুই বউ সেজে বসে আছিস কেন? পালিয়ে যা না।'

জরী অবাক হয়ে তাকাল।

বড়চাচী বললেন, পেছনের দরজা দিয়ে বের হ। কোনো বান্ধবীর বাসায় চলে যা। তারপর দেখা যাবে।

'আমার সাহসে কুলাচ্ছে না চাচী।'

'তুই আয়তো আমার সাথে। পরের বাড়িতে থেকে থেকে তোদের সব গেছে। সাহস গেছে, মর্যাদাবোধ গেছে, তোদের সাথে আমার কথা বলতে ঘেন্না লাগে। আয় আমার সাথে আয়। টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি। ওকে নিয়ে কোনো এক বান্ধবীর বাড়িতে লুকিয়ে থাক।'

'সত্যি বলছেন?'

'সত্যি বলছিনাতো কি— তোর সঙ্গে রস করছি? আমার রস করার বয়স?'

বড়চাচী নিজেই পেছনের দরজা দিয়ে জরীকে বের করলেন। তাঁর সেজো ছেলে টুকুনকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন।

তারা একটা বেবীটেক্সি নিল।

টুকুল বলল, তুমি যাবে কোথায় জরী আপা?

'দারুচিনি দ্বীপে যাব।'

'সেটা কোথায়?'

'অনেক দূর। তুই আমাকে কমলাপুর রেলস্টেশান নামিয়ে এই বেবীটেক্সী নিয়েই বাসায় ফিরে যাবি। পারবি না?'

'খুব পারব। ঢাকা শহরে আমার মতো কেউ চিনে না।'

টুকুনের বয়স দশ এত বড় দায়িত্ব পেয়ে সে খুবই আনন্দিত।

১২

অয়ন একটা স্যুটকেশ এবং হ্যান্ডব্যাগ হাতে সন্ধ্যা থেকেই তার ছাত্রের বাসায় বসে আছে। ছাত্রের খোঁজ নেই। শুধু ছাত্র না, বাড়িতেই কেউ নেই, সবাই দলবেঁধে বিয়ে খেতে গেছে।

কাজের ছেলেটি বলল, বসেন মাষ্টার সাব। চা খান। বাড়িতে লোকজন না থাকলে কাজের লোকরা খুব সামাজিক হয়ে উঠে। আগ্রহ করে চা-টা দেয়। অয়ন জিজ্ঞেস করল, কখন ফিরবে?

'তার কি কোনো ঠিক আছে। বিয়া বাড়ি বইল্যা কথা। রাইত নয়টার আগে না।'

রাত ন'টা হলে অপেক্ষা করা যায়। ন'টা, দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যেতে পারে। একটা বেবীটেক্সি নিলে দশ মিনিটে ষ্টেশনে চলে আসবে। জিনিসপত্রতো সব সঙ্গেই আছে। অসুবিধা কিছু নেই।

অয়নের মনে হলো ন'টার আগেই তার ছাত্র চলে আসবে। স্যারের কথা নিশ্চয়ই তার মনে আছে। গতকালইতো সে বলেছে, চিন্তা করবেন না স্যার আমি ব্যবস্থা করে রাখব। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করে রেখেছে।

অয়ন বলল, বিয়ে কোথায় জান না-কি করিম?

'জ্বে না। কিছুই জানি না। চা দিমু?'

'আচ্ছা দাও। চা দাও।'

রাত দশটার ভেতর সে সর্বমোট ছ'কাপ চা খেল। বেশ কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইল তার ছাত্রের কালো গাড়ি যদি দেখা যায়।

রাত দশটা পাঁচে কাজের ছেলে এসে বলল, তারা আইজ আর আসব না। চইলা গেছে মীর্জাপুর।

'তুমি বুঝলে কি করে?'

'আম্মা টেলিফোন করছিল।'

'আমি যে বসে আছি এটা বলেছ?'

'জ্বে না। ইয়াদ ছেল না।'

অয়নের মনে আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে। এমনতো হতে পারে তার ছাত্র ড্রাইভারকে দিয়ে ষ্টেশনে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ সে জানে তার স্যার রাত সাড়ে দশটার ট্রেনে যাচ্ছে। বিয়ের তাড়াহুড়ায় মনে ছিল না। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছে। সে কি চলে যাবে ষ্টেশনে?

'করিম!'

'জ্বে মাষ্টার সাব।'

'তারা কোত্থেকে টেলিফোন করেছে?'

'তাতো জানি না।'

'এই বাসায় কি কেউ নেই? সব চলে গেছে?'

'জ্বে। বড় সাবের এক ভাই আছেন।'

'তুমি উনাকে একটু জিজ্ঞেস করে আসবে আমার কথা বাবু কিছু বলে গেছে কি না। আমাকে কিছু টাকা দেয়ার কথা ছিল। বাবু কি উনার কাছে দিয়ে গেল কি-না।'

করিম খোঁজ নিয়ে এল। বাবু কিছুই বলে নি।

অয়ন পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হলো বাবু ড্রাইভারকে দিয়ে স্টেশনেই টাকা পাঠিয়েছে। এতক্ষণ এইখানে নষ্ট না করে তার উচিত ছিল স্টেশনে চলে যাওয়া। বিরাট ভুল হয়েছে।

অয়ন ঘর থেকে বের হয়েই বেবীটেক্সি নিল। হাতে সময় একেবারেই নেই।

১৩

কমলাপুর রেলস্টেশনে শুভ্র দাঁড়িয়ে আছে।

এত লোকজন চারপাশে সে কাউকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। মানুষগুলোই মনে হচ্ছে ছায়া মূর্তি, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেও সে তিন জনের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ভেবেছিল এ রকম সমস্যা হবে। দলের অন্যদেরই বা সে কি করে খুঁজে বের করবে। একমাত্র উপায় যদি ওদের কেউ তাকে দেখতে পায়। এখনো কেউ দেখতে পায় নি। ওরা কি আসে নি? সাড়ে ন'টা বাজে। এর মধ্যেতো এসে পড়া উচিত। এত দেরী করছে কেন?

'আপনি, আপনি এখানে?'

শুভ্র তাকাল। তার সামনে একটি তরুণী মূর্তি তা সে বুঝতে পারছে, কিন্তু চিনতে পারছে না। গলার স্বরও অচেনা। নিশ্চয় ক্লাসের কোনো মেয়ে। ক্লাসের মেয়েরা ছেলেদের তুমি তুমি করে বলে, শুধু শুভ্রের বেলায় আপনি। দোষটা অবশ্যি শুভ্রর। সে ক্লাসের কোনো মেয়েকে তুমি বলতে পারে না।

'আপনি বোধ হয় আমাকে চিনতে পারছেন না। আমার নাম জরী। সাবসিডিয়ারীতে আমরা এক সঙ্গে ক্লাস করি।'

'ও আচ্ছা।'

'এখনো আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি? আপনার সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমার কথা হয়েছে।'

শুভ্র অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমি চিনতে পেরেছি।

'তাহলে বলুন আমার নাম কি?'

শুভ্র বিব্রত গলায় বলল, আমি চোখে কিছুই দেখতে পারছি না। এই জন্যে কিছু চিনতেও পারছি না। আমার চশমা ভেঙ্গে গেছে। চশমা ছাড়া আমি কিছুই দেখি না।

জরী বলল, আমরা সবাই এই খবর খুব ভালো জানি। আপনার নাম হচ্ছে কানা বাবা। আমরা মেয়েরা অবশ্যি কানা বাবা বলি না।

'আপনারা কি বলেন?'

আমরা বলি—The learned blind father.

'Learned?'

'লারনেড না ডেকে উপায় আছে। যে ছেলে জীবনে কোনো দিন কোনো পরীক্ষায় ফার্স্ট ছাড়া সেকেন্ড হয় নি তাকে ইচ্ছে না থাকলেও লারনেড ডাকতে হয়।'

শুভ্র অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছে।

বিব্রত বোধ করার প্রধান কারণ সে এখনো মেয়েটিকে চিনতে পারে নি।

জরী বলল, আপনি কি দারুচিনি দ্বীপে যাচ্ছেন?

'জ্বি।'

'আমাকে এত সম্মান করে জ্বি বলতে হবে না। আমিও আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি। আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? এই প্লাটফরম থেকে ময়মনসিংহ লাইনের গাড়ি যায়। আপনার গাড়ি ছাড়বে চার নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে।'

শুভ্র হাসি মুখে বলল, আমিতো এ সবের কিছুই জানি না। এক জন লোক হাত ধরে ধরে এখানে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছে। তারপর থেকে দাঁড়িয়েই আছি।

জরী বলল, চলুন হাত ধরে ধরে আপনাকে চার নম্বর প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাই। ধরুন হাত ধরুন। সংকোচ করার কিছু নেই। আপনি হচ্ছেন কানা বাবা।

জরী ভেবে পেল না সে হঠাৎ এত কথা বলছে কেন? সে তো চুপচাপ ধরনের মেয়ে। এত কথাতো সে কখনো বলে না আজ তার হয়েছেটা কি?

'শুভ্র হাত ধরল। খানিকটা ইতস্ততঃ করে বলল, আপনিই বা কেন এদিকে এলেন? আপনারওতো চার নম্বর প্ল্যাটফরমে থাকার কথা।'

'কেউ এখনো আসে নি তাই ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। আচ্ছা আপনার চোখ এত খারাপ আপনারতো উচিত বাড়তি চশমা রাখা।'

শুভ্র বলল, এক্সট্রা চশমা বাড়িতে আছে।

জরী বলল, আপনার ব্যাগ কে গুছিয়ে দিয়েছে বলুনতো?

'আমার মা।'

'তাহলে ব্যাগ খুললেই বাড়তি চশমা পাওয়া যাবে। দেখি আপনার ব্যাগটা খুলি। চাবি দিনতো।'

শুভ্র বলল, আমার মনে হয় না। মা বাড়তি চশমা দিয়েছেন।

'অবশ্যই দিয়েছেন। কোনো মা এত বড় ভুল করবে না। দিন চাবি দিন।'

ব্যাগ খুলতেই খাপে মোড়া দু'টা চশমা পাওয়া গেল।

চোখে চশমা দিয়ে শুভ্র বিস্মিত হয়ে বলল, আপনি এত সেজেছেন কেন?

'আজ রাতে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল। এটা হচ্ছে বিয়ের সাজ। বিয়ে

হয়নি বলেই যেতে পারছি।'

শুভ্র বলল, ভাগ্যিস হয় নি। বিয়ে হলে আপনার সঙ্গে দেখা হত না। আমারো দারুচিনি দ্বীপে যাওয়া হত না। বোকার মতো একা একা ভুল প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে থাকতাম। কেউ আমাকে খুঁজে পেত না। আর পেলেও কেউ বুদ্ধি করে বলতে পারত না যে আমার ব্যাগে এক্সট্রা চশমা আছে। আমাকে যেতে হত অন্ধের মতো।

জরী হাসল।

এখন তার সব কিছুই ভালো লাগছে। পৃথিবীটা অনেক বেশি সুন্দর মনে হচ্ছে। স্টেশনের হৈ চৈ আলো সব মিলিয়ে কেমন যেন নেশা ধরে যাচ্ছে। বার বার মনে হচ্ছে পৃথিবী এত সুন্দর কেন? আরেকটু কম সুন্দর হলে তো ক্ষতি ছিল না। দুই জন হাঁটছে ছোট ছোট পা ফেলে। শুভ্র হঠাৎ কি মনে করে বলে ফেলল, চশমাটা পাওয়া না গেলেই ভালো হত।

'কেন?'

'আপনি আমাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যেতেন। আপনি যখন আমার হাত ধরে হাঁটছিলেন আমার অসম্ভব ভালো লাগছিল। কিছু মনে করবেন না— কথাটা বলে ফেললাম। বেশির ভাগ সময় আমরা মনের কথা বলতে পারি না বলে কষ্ট পাই। আমি ঠিক করেছি আমি এই ভুল কখনো করব না। যা বলতে ইচ্ছা করে— তা বলব। আপনি কি রাগ করলেন?

জরী সহজ গলায় বলল, না রাগ করি নি। আপনি বরং এক কাজ করুন চশমাটা খুলে পকেটে রেখে দিন। আমি আপনাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাই। নয়ত ওরা দেখলে হাসাহাসি করবে।

শুভ্র চশমা খুলে পকেটে রাখল।

জরী তাকে হাত ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। দলটির সঙ্গে দেখা হলো। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল— কানা বাবা। কানা বাবা।

আনুশ্‌কা ছুটে এসে বলল, জরী তোরতো যাওয়ার কথা ছিল না।

জরী বলল, চলে এলাম।

'খুব ভালো করেছিস। খুব ভালো। তুই কানা বাবাকে কোথায় পেলি?'

'পেয়ে গেলাম। বেচারা চশমা ভেঙ্গে ফেলেছে। হাত ধরে আনা ছাড়া উপায় কি?'

দলের সবাই আবার চেঁচিয়ে উঠল— কানা বাবা। কানা বাবা।

সঞ্জুর বাবাও এসেছেন।

সঙ্গে মুনাকে নিয়ে এসেছেন। সঞ্জু খুব অস্বস্তি বোধ করছে।

সে বুঝতে পারছে তাকে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে গা টেপাটেপি হচ্ছে। মোতালেব

ফিস ফিস করে বলল, দেখ সবাই দেখ খোকাবাবুর বাবা ফিডিং বোতল হাতে চলে এসেছে। লোকটার কি বুদ্ধি শুদ্ধি নেই?

সবাই ট্রেনে উঠেছে। প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায় নয়। থার্ড ক্লাসে। তাতে কারোর আনন্দে ভাঁটা পড়ছে না। হাসাহাসি, আনন্দ উল্লাসের সীমা নেই। আনুশ্‌কা পাশের অচেনা এক ভদ্রলোককে বলল, ব্রাদার আপনি কি সেন্ট মেখেছেন গন্ধে বমি এসে যাচ্ছে। সেই লোক হতভম্ব।

জরী শুভ্রকে বলল, আপনি চশমা পরছেন না কেন?

শুভ্র হাসিমুখে বলল, আমি চশমা পরব না বলে ঠিক করেছি।

'বেশ তাহলে হাত ধরুন। আপনাকে ট্রেনে নিয়ে তুলি।'

মোতালেব চেঁচিয়ে বলল, ভাইসব রাস্তা করে দিন, কানা বাবা আসছে কানা বাবা। দি লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার।

নীরা চেঁচিয়ে বলল, অবিকল এই রকম একটা দৃশ্য আমার কল্পনায় ছিল। সুনীল অন্ধ হয়ে গেছে। আমি তার হাত ধরে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সুনীল এই পৃথিবীকে দেখছে আমার চোখ দিয়ে। বানিয়ে বলছি না। বিশ্বাস কর। এই দ্যাখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

আনুশ্‌কা বলল, লারনেড ব্লাইন্ড ফাদারকে সারাক্ষণ হাত ধরে ধরে কে টানবে? চিটাগাং নেমেই ওর জন্যে চশমার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনুন লারনেড ব্লাইন্ড ফাদার, সব সময় আমরা আপনাকে আপনি বলেছি, এখন আর বলব না। দয়া করে কিছু মনে করবেন না।

শুভ্র হাসল। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, আমি খুব খুশি হব যদি তা করেন।

'আরেকটা কথা এমন ফরম্যাল ভঙ্গিতে কথা বলবেন না, বললে চিমটি খাবেন।'

'জ্বি আচ্ছা। আর বলব না।'

রানা বলল, একটা গান ধরলে কেমন হয়?

নীরা বলল, খুব খারাপ হয়। আচ্ছা আমি বসব কোথায়? আমার তো বসার জায়গা নেই।

রানা বলল, তুমি এবং সুনীল তোমরা দুই জন দাঁড়িয়ে যাও। হাত ধরা ধরি করে দাঁড়িয়ে থাক।

'আমার দাঁড়িয়ে যেতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সুনীলকে বসতে দাও। জানালার পাশে বসতে দাও। বেচারা কবি মানুষ।'

সত্যি সত্যি জানালার পাশে খানিকটা জায়গা খালি করা হলো। সেখানে কেউ বসল না।

মুনা লক্ষ্য করল সবাই আছে শুধু অয়ন নেই।

সে কি যাচ্ছে না? কাউকে জিজ্ঞেস করতে তার খুব লজ্জা লাগছে তবু লজ্জা ভেঙ্গে মোতালেবকে জিজ্ঞেস করল।

মোতালেব বিরক্ত মুখে বলল, যাওয়ারতো কথা, গাধাটা এখনো কেন আসছে না কে জানে। ট্রেন মিস করবে। গাধারা সব সময় এ রকম করে। আগে একবার পিকনিকে গেলাম। সে গেল না। পরে শুনি চাঁদার টাকা জোগাড় হয় নি। আরে এক জন চাঁদা না দিলে কি হয়। সবাইতো দিচ্ছি।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, উনার কি টাকার জোগাড় হয় নি?

মোতালেব বলল, কি করে বলব। আমাকেতো কিছু বলে নি।

মুনা অসম্ভব রকম মন খারাপ করে বাবার কাছে চলে এল। আর তখনি সে অয়নকে দেখল। অয়ন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় সে চাচ্ছে না কেউ তাকে দেখে ফেলুক। মুনা চেঁচিয়ে ডাকল, অয়ন ভাই। অয়ন ভাই।

অয়ন প্ল্যাটফর্মে গাদা করে রাখা প্যাকিং বাক্সগুলোর আড়ালে সরে গেল। মুনা এগিয়ে গেল। পিছনে পিছনে এলেন সোবাহান সাহেব।

মুনা বলল, অয়ন ভাই আপনি যাচ্ছেন না। ট্রেনতো ছেড়ে দিচ্ছে।

অয়ন কি বলবে ভেবে পেল না। সোবাহান সাহেব উত্তেজিত গলায় বললেন, দৌড়ে গিয়ে উঠ। সিগন্যাল দিয়ে দিয়েছে।

অয়ন নীচু গলায় বলল, চাচা আমি যাচ্ছি না।

'যাচ্ছ না কেন?

'টাকা জোগাড় করতে পারি নি। এক জনের দেয়ার কথা ছিল সে শেষ পর্যন্ত...'

গার্ড বাঁশি বাজিয়ে দিয়েছে। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। অয়ন ছোট্ট করে নিঃশাস ফেলল।

মুনার চোখে পানি এসে গেছে। সে জল ভেজা চোখে তার বাবার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোবাহান সাহেব পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে শান্তগলায় বললেন, বাবা এই নাও এখানে ছয়শ টাকা আছে। তুমি যাও দৌড়াও।

অয়ন ধরা গলায় বলল, বাদ দিন চাচা। আমি যাব না।

তার খুব কষ্ট হচ্ছে সে কখনোই কোথাও যেতে পারে না। তার জন্যে খুব কষ্টতো তার হয় না। আজ কেন হচ্ছে?

সোবাহান সাহেব বললেন, এক থাপ্পর দেব। বেয়াদপ ছেলে। দৌড় দাও। দৌড় দাও।

মুনা বলল, যান অয়ন ভাই যান। প্লীজ।

অয়ন টাকা নিল।

সে দৌড়াতে শুরু করেছে। তার পেছনে পেছনে দৌড়াচ্ছে মুনা। সে কেন ছুটছে তা সে নিজেও জানে না।

দলের সবাই জানালা দিয়ে মুখ বের করে তাকাচ্ছে। মোতালেব এবং সঞ্জু হাত বের করে রেখেছে—কাছাকাছি এলেই টেনে তুলে ফেলবে। এইত আর একটু। আর একটু...।

সোবাহান সাহেব চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করছেন—'হে মঙ্গলময় ঈশ্বর। এই ছেলেটিকে দারুচিনি দ্বীপে যাবার ব্যবস্থা তুমি করে দাও।'

ট্রেনের গতি বাড়ছে।

গতি বাড়ছে অয়নের। আর ঠিক তার পাশাপাশি ছুটছে মুনা। সে কিছুতেই অয়নকে ট্রেন মিস করতে দেবে না। কিছুতেই না।

হুমায়ূন আহমেদ-এর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিত নরকে' প্রকাশিত হয় ১৯৭২-এ। এই অর্থে তাঁকে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রায় সমকালীন এক আখ্যানকার বলা যায়।
জন্ম : ১৯৪৮, ১৩ নভেম্বর, ময়মনসিংহ জেলার কুতুবপুর গ্রামে। রসায়নের ছাত্র, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ডাকোটা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ. ডি ডিগ্রি পেয়েছেন, পলিমার-কেমিস্ট্রিতে গবেষণার জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের এই অধ্যাপক—১৯৮১-তে তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি পান, 'বাংলা একাডেমী পুরস্কার' এ। ১৯৯৪-এ পান সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান একুশে পদক। ১৯৭২ থেকে ১৯৯৮-এর সার্ধ-দুই দশকে, তাঁর 'উপন্যাস সমগ্রে'র দশম খণ্ডই শুধু প্রকাশিত হয় নি, তার সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'সায়েন্স ফিকশন সমগ্র' এবং এক আশ্চর্য-চরিত্র মিসির আলি'র আখ্যান নিয়ে 'মিসির আলি অমনিবাস'। একাধিক কাহিনী নিয়ে নির্মিত হয়েছে, দূরদর্শন-চিত্র এবং নাটক। তাঁর পরিচালিত ছবি আগুনের পরশমণি শ্রেষ্ঠ ছবিসহ ৮টি শাখায় পেয়েছে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। সম্মানিত হয়েছেন— শিশু একাডেমী পুরস্কার, লেখক শিবির পুরস্কার, মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন স্বর্ণপদক, অতীশ দীপংকর স্বর্ণপদকসহ আরো বহু পুরস্কারে।

Daruchinir Dip_Humayun Ahmed

suman_ahm@yahoo.com

Created with an unregistered version of SCP PDF Builder

You can order SCP PDF Builder for only $19.95USD from
http://www.scp-solutions.com/order.html